হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 4, Issue No. 8, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, May 2015

''মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অদ্ভুত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক মুসলমান প্রীতি যে ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের কি গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে---একদিন ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহার বিচার করিবে।''

—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
প্রখ্যাত ঐতিহাসিক

নদীয়ার কালিগঞ্জ থানার নওদা গ্রামে মুসলিম দুষ্কৃতিদের হামলায় নিহত ৩

গত ৪মে, ২০১৫ নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ থানার নওদা গ্রামে মুসলমান দুষ্কৃতিদের সুপরিকল্পিত আক্রমণে তপশীলি জাতির তিনজন হিন্দু নিহত হল। ওই দিন বিকাল তিনটা নাগাদ চুটিপুর এবং নওদা পশ্চিম পাড়া থেকে প্রায় ৩০০ মুসলমান নওদা হাজরা পাড়ার তপশীলি হিন্দুদের উপর হামলা করে। প্রথমে এই দুষ্কৃতির দল জনৈক ঝুলন মন্ডলের মুদিখানা দোকান লুঠ করে। তারপরে হাজরা পাড়ায় ঢুকে প্রায় ২৫ টি হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগায়। এই পরিস্থিতি দেখে পাড়ার হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে গেলেও জনৈক মারো হাজরা এবং তার পরিবার বাড়ির মধ্যে আটকে পড়ে। মারমুখী মুসলমানরা মারো হাজরার

বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং তার ১৮ বছরের ছেলে অসময় (অক্ষয়) কে গুলি করে হত্যা করে। অর পর বাড়ির ভিতরে ঢুকে পরিবারের সকলকে কাস্তে, দা, প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। এই আক্রমণে মারো এবং তার ভাই শান্তনু হাজরা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। গুরুতর আহত অবস্থায় মারোর স্ত্রী অপর্ণা, ভাই ময়না, প্রতিবেশী সনাতন সরকার ও তার স্ত্রী মুক্তা সরকারকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাজরা পাড়ার একটি মনসা মন্দিরের উপর বোম মেরে ওই মন্দিরটিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

পরের দিন নদীয়ার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের জন্য নগদ টাকা এবং নিহতদের পরিবারে একজন সদস্যকে চাকরী দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

যদিও ঘটনার সূত্রপাত জুরানপুরের হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় মসজিদের সামনে থেকে বোম মারাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু জানা গেছে এলাকায় বকরী ঈদে গরু কাটা নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আগে থেকেই উত্তেজনা ছিল।

৩ রা মে তারিখ জুরান পুরের হিন্দুরা যখন ধর্মরাজের মেলার উদ্দেশ্যে নওদার মসজিদের পাশ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছিল, তখন ওই মসজিদের দিক থেকে শোভাযাত্রাকে লক্ষ করে বোম মারা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় জুরান পুরের হিন্দুরাও ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের কিছু বাড়িঘরে ভাঙচুর চালায়। কিন্তু নওদার হিন্দুরা এই ঘটনার সাথে কোনভাবেই সম্পর্কিত না থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের উপরে হামলা করে।

প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায়
রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে বচসা, মারামারি

হুগলী জেলার ফুরফুরা শরিফের কাছে সন্তোষপুর ও বসন্তপুর গ্রামের পাশে জে এল ১১৪ দাগ নং ৩৮৭ একটি রাস্তা আছে যা জেলা বোর্ডের রেকর্ডভুক্ত এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য। সি এস ম্যাপ ও এল আর রেকর্ডভুক্ত উক্ত রাস্তাটি ৩১ নং বাসরুটে দিঘির মোড় বাসস্টপ্ থেকে উত্তর দিকে এম.এস.কে বিদ্যালয় (বসন্তপুর) ভায়া মানিকপাড়া, মাঝপাড়া, পোড়েলপাড়া ও আদিবাসীপাড়া হয়ে অমরপুর মোড়ে উঠেছে। পঞ্চায়েত দ্বারা রাস্তাটি নির্মাণ কাজ চলাকালীন গত ২৬শে এপ্রিল সন্তোষপুর নিবাসী সেখ সামসুদ্দিন (পিতা আল্লারাখা)-এর নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা রাস্তা নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। তাদের বক্তব্য, বর্তমান রাস্তাটি বন্ধ করে দিয়ে তাদের পাড়া দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরি করতে হবে। সাধারণ মানুষ পূর্বের রাস্তাটি রেখে নতুন একটি রাস্তা নির্মাণের কথা বললেও তারা রাজি হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে এলাকার মানুষ বিষয়টি বিডিও কে জানায়। এরপর রাস্তার কাজ পুনরায় শুরু হলে ৫ই মে সেখ সামসুদ্দিনের নেতৃত্বে সেখ আসগার আলি, (পিতা আকবর সেখ), সেখ রেওজান, সেখ আব্বাস (পিতা জয়নালী), আয়সার মাল্লি (পিতা সৈয়দ আলি মাল্লি)-সহ অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন এসে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেয়। মাঝিপাড়া, মালিকপাড়া, আদিবাসী পাড়ার লোকেরা এর প্রতিবাদ করলে অতর্কিতে তারা আক্রমণ করে বসে। বেশ কয়েকজনকে মারধোর করে, মেয়েদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেয়। এদের বিরুদ্ধে জাঙ্গিপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানার ওসি সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত বসিয়ে রেখেও কোন অভিযোগ নেননি। এতে দুষ্কৃতিরা যে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে এবং যে কোন সময় তাদের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে ভেবে গ্রামের মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। অসহায় মানুষগুলো এরপর হিন্দু সংহতি-র হুগলী জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে। জেলা নেতৃত্ব সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

আমতায় প্রতিরোধ গড়ে তুলল হিন্দু সংহতির ছেলেরা

হাওড়া জেলার আমতা থানার ছোট মহড়া গ্রামের হিন্দু সংহতির ছেলেদের প্রতিরোধে অন্যায়ভাবে জমি দখল রোখা সম্ভব হয়েছে। ছোট মহড়া গ্রামের মুখে বাঁধের গায়ে মুর্শিদাবাদ থেকে কাজ করতে আসা মিস্ত্রীদেরকে স্থানীয় কয়েকজন থাকার জন্য ঘরদোর করতে বলে এবং তারাও দ্রুত ঘর তৈরি করে নেয়। ছোট মহড়া গ্রামের ছেলেরা একসাথে গিয়ে ঘরগুলো ভেঙে দেয় এবং যে সমস্ত হিন্দু মিস্ত্রী ও লোকজন এদেরকে ঘর তৈরি করতে বলেছিল, তারা বাধা দিতে গেলে তাদেরকে মারধোর করে। কারণ একবার ঘর তৈরি করে বাস করতে দিলে আগামীদিনে আর তাদের তোলা যাবে না। এরাই পরবর্তীকালে বৃহত্তর সমস্যা করবে গ্রামে।

আর একটি ঘটনা হল ছোট মহড়া গ্রামের মুসলমানরা কবরস্থান ঘেরার নাম করে হিন্দুদের জায়গার উপর পাঁচিল দিচ্ছিল। হিন্দু যুবকেরা একত্রিত হয়ে পাঁচিল দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সেখানকার স্থানীয় রাজনৈতিক দল পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি।

চৈত্রমাসে গাজন উপলক্ষে আমতা সি.টি.সি বাসস্ট্যান্ডে অর্জুন শালের নেতৃত্বে হিন্দু সংহতির ফেট্টি মাথায় বেঁধে প্রায় শতাধিক ছেলেমেয়ে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে উলুবেড়িয়া থেকে পায়ে হেঁটে আমতা শিবমন্দিরে এসে জল ঢালে। এতে স্থানীয় মানুষরা উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়ে এদেরকে সাহায্য করে।

স্কুলের জমি কোনরকমে বাঁচানো গেল

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার রমানাথপুর গ্রামের কোলে পাড়ায় ৪ঠা মে ২০১৫ ইউসুফ মল্লিকের সঙ্গে স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিবাদ শুরু হয়। বিবাদের কারণ ১৯৫৬ সালে একটি জমি ওই গ্রামেরই বাসিন্দা ভবানীপ্রসাদ পাল ও অনিল পাল স্কুলকে দান করেন। সেই দানপত্র ও দলিল স্কুলের কাছে গচ্ছিত আছে। কিন্তু তার মিউটেশন করানো হয়নি। ইউসুফ মল্লিক ভবানীপ্রসাদ পালের একজন শরিক অপূর্ব পালের কাছ থেকে বেআইনিভাবে জমিটি কেনেন। ইউসুফ মল্লিক ৪মে জমিটির উপর নির্মাণ কাজ করতে গেলে ওই গ্রামেরই বুবাই পাল বাধা দেয়। বাধা দেওয়ার সময় হাতাহাতিতে বুবাই পালের জামা ছিঁড়ে যায়। ওই দিন সন্ধ্যাবেলায় ইউসুফ মল্লিক ও তার লোকজন স্থানীয় হিন্দুদের বাড়িতে চড়াও হয়। রমানাথপুর প্রগতি সংঘ ক্লাবের ছেলেরা ও পাশের গ্রাম গোকুলপুরের বর্গক্ষত্রিয়েরা মিলে ওই আক্রমণ প্রতিহত করে। পরেরদিন ৫ই মে সকাল ১১টার সময় প্রায় ১৫০ জন হিন্দু বুবাই পালের নেতৃত্বে চণ্ডীতলা থানা ঘেরাও করে। এরপর চণ্ডীতলা থানার ওসি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ওই গ্রামে ঢোকেন এবং নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত নেপালবাসীকে
হিন্দু সংহতি-র পক্ষ থেকে জানাই
সমবেদনা ও সহমর্মিতা।

আমাদের কথা

এমন কৃতঘ্ন কাজ শুধু ওরাই করতে পারে

গত ২৫শে এপ্রিল এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপালসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল নেপালের পোখরা আর কম্পনের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৭.৯ মাত্রার। স্বভাবতই মুহূর্তে নেপালের পোখরা, কাঠমাণ্ডু সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ল অসংখ্য মানুষ। মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়েছে নেপালে। তাদের প্রধানমন্ত্রীর অনুমান তা দশ হাজার ছাড়াবে। ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতে এই বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ৭৫ জন মারা গিয়েছে, ভেঙে পড়েছে ঘরবাড়ি।

আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি মেনে বহু দেশ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বন্ধু-শত্রুর ব্যবধানও এই সময়ে ঘুচে যায়। ভারত তার বন্ধু রাষ্ট্রের ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চীনও এগিয়ে এসেছে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে। ইউরোপের দেশগুলো ও আমেরিকা খাদ্য পানীয়ের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে উদ্ধারকার্যে সাহায্য করতে।

সার্ক অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র পাকিস্তানও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নেপালের দিকে। তারা প্যাকেটে ভরে খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়েছে নেপালবাসীদের জন্য। কিন্তু কী সেই খাদ্যসামগ্রী? 'বীফ (গরুর মাংস) মশালা'। ভাবতে পারা যায় কী জঘন্য হীন নীচ মানসিকতা এদের। যেখানে পাকিস্তান ভালো করেই জানে নেপালের জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ হিন্দু এবং হিন্দুরা গো-মাতা রূপে গরুকে পুজো করায় নেপালে গরুর মাংস নিষিদ্ধ। তবু তারা গরুর মাংস পাঠালো কেন? ভাববার বিষয়? এর পিছনে আছে তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি, যাকে অপসংস্কৃতি বলাই ভালো। ইসলাম মতে বিধর্মী মানে তো কাফের। সেই কাফেরদের দেশে ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে, এতে ইসলামের পবিত্র ভূমি পাকিস্তানের উল্লাসিত হওয়ার কথা। এই শিক্ষাই তো তারা ইসলাম থেকে পেয়েছে। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক রীতি মেনে উল্লাসকে ঢেকে তারা ত্রাণ পাঠিয়েছে নেপালে। মন থেকে নয়, কিছুটা আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের মান-সম্মান রাখতে। তাই হিন্দু অধ্যুষিত নেপালের অধিবাসীদের ধর্মনাশের জন্য তারা প্যাকেটে ভরে গরুর মাংস পাঠিয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে এমন নির্মম বঞ্চনা বোধহয় আর কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামের সমর্থকরা সব পারে। ইসলাম যে মানবতা বিরোধী সেটা আর একবার প্রমাণ হল এই ঘটনায়।

প্রসঙ্গক্রমে, ২০০৮ সালে বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঝড় আয়লায় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখনও ইসলামের অনুরাগীদের এইরকম নারকীয় আচরণ করতে দেখেছিলাম। অসহায় গরীব মানুষগুলো যখন দুমুঠো অন্নের প্রত্যাশায় নদীর পাড়ে বসে থাকতো, তখন বিভিন্ন ইসলামিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের মধ্যে বীফ (গোরুর মাংস) বিরিয়ানী বিলি করেছিল। এহেন জঘন্য কাজ এরা ছাড়া আর কেউ বা করতে পারে বলুন।

আর এক ধরণের জীবের আচরণ দেখেও ভীষণ আশ্চর্য হয়েছি। তারা হলেন বাঙালি বুদ্ধিজীবী। এমন দু'পেয়ে জীব আফ্রিকার গভীর জঙ্গল বা আমাজনের রহস্যময় জঙ্গলেও দুর্লভ। অথচ এরা পশ্চিমবঙ্গের অভিজাত এলাকার কোঠাবাড়ির শোভা বৃদ্ধি করেন। এরা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলেন কিন্তু এদের বুদ্ধির কৃশতা নিয়ে সংশয় নেই। কিংবা এদের বুদ্ধি শুধু স্বার্থতেই সীমাবদ্ধ। নেপালে এতবড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় হল, বিপুল সম্পত্তি বিনষ্ট হল, অসংখ্য মানুষ মারা গেল, অথচ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা নির্বিকার রইলেন। অথচ গাজায় ইজরায়েলি আক্রমণ হলে, ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা আক্রমণ করলে আপনাদের বুদ্ধি তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। মোমবাতি হাতে রাজপথে নেমে পড়েন আপানারা, ধর্মতলায় মানববন্ধন করেন, টিভিতে মুখ দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদের মুণ্ডপাত করেন। এর পিছনে অপনাদের কোন দুরভিসন্ধি আছে, আর তা ধীরে ধীরে সাধারণের সামনে উন্মোচন হয়ে যাচ্ছে। আপনারা অত্যন্ত হীন, নীচতার পরিচয় দিচ্ছেন, স্বার্থপরতার পরিচয় দিচ্ছেন। কোন এক অজ্ঞাত রাজার দরবারে আপনাদের বুদ্ধি বিক্রিত আছে। তার অঙ্গুলিহেলনে আপনারা কাজ করে চলেছেন, তা দেশের যতই স্বার্থবিরোধী হোক। আপনারা কখনই ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা কিংবা বিনয়-বাদল-দীনেশের জাত নন। তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে আপন জীবন উৎসর্গ করেছিল। আর আপনারা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক চরম অন্ধকারের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। ভাবলে অবাক লাগে বাঙালি বুদ্ধিজীবী বলতে একসময় রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে বোঝাতো। আর আপনারা? আজব এক জীব। আজব এক চীজ্‌ও বটে।

চূড়ান্ত বর্বরতা দেখালো পাকিস্তানী সেনা

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত নেপালে উদ্ধার কাজে গিয়ে চূড়ান্ত বর্বরতা দেখালো পাকিস্তানী সেনা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের নির্দেশে প্রায় একশো জন পাকিস্তানী সেনা উদ্ধারকার্যে অংশ নেয়। কিন্তু হঠাৎ অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করা যায় কিছু কিছু পাকিস্তানী সেনা সদস্যদের মধ্যে। নেপালে কাজের প্রথম থেকে ৫-৮ জনের একটি পাকিস্তানী সেনাদল উদ্ধারকাজে গণ্ডগোল করছিল। কখনো কখনো তাদের জন্য সহজ কাজও করা যাচ্ছিল না। এইসব সেনাসদস্যদের ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত লোকের হাত-পা কেটে ফেলার আগ্রহ দেখে অন্য পাকিস্তানী সেনাদের মনে সন্দেহ হয় এবং তাদের আটক করে। পরে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় এসব পাকিস্তানী সেনা সদস্য নেপালে ভূমিকম্পে আক্রান্ত মানুষের সেবা করতে ইচ্ছুক নয়। কারণ তারা মনে করে নেপালে যেহেতু ৯৫ শতাংশ হিন্দু তাই ইসলামী মতে এদের উদ্ধার কাজ করা সম্পূর্ণ হারাম। বিষয়টি জানার পর ৭জন সেনাসদস্যকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন।

যে কোন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ধারকাজে সেনা সদস্য পাঠানো অনেকটা আন্তর্জাতিক রীতিনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০০০ সালে গুজরাট ভূমিকম্প কিংবা তারও আগে বা পরে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সদস্যরা এদেশে উদ্ধার কাজ করার যেমন উদাহরণ আছে, তেমনি ভারতীয় সেনা সদস্যরাও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই ধরণের কাজে অংশগ্রহণ করার নজির আছে। নেপালের সিংহভাগ বাসিন্দা হিন্দু বলে কতিপয় পাকিস্তানী সেনা যে ধরণের জঘন্য হীন আচরণ করেছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সেনাসদস্যদের দ্বারা এমন ঘটনার নজির আছে বলে মনে হয় না।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

হিন্দু সংহতির পথসভাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ালো

চারটের মধ্যেই পুলিশ ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার মোড় দখল করে নিয়েছিল। রবীন্দ্র জয়ন্তী-র জন্য লাগানো মাইকগুলো পুলিশের নির্দেশে শব্দ আইন অমান্য করে তারস্বরে বাজানো হচ্ছিল। উদ্দেশ্য হিন্দু সংহতির পথসভাকে বানচাল করে দেওয়া। কিন্তু এত করেও হিন্দু সংহতির তরুণ সাহসী কর্মীদের আটকানো যায়নি। তপন ঘোষের একটি মাস্টার স্ট্রোকে পথসভা বিক্ষোভ মিছিলে পরিণত হল। স্লোগান, পুলিশের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, পথ অবরোধ, সব মিলিয়ে বিকাল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সমস্ত বৌবাজার চত্বর হিন্দু সংহতি কর্মীদের দখলে চলে গিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটে গত ৮ই মে কলকাতার বৌবাজারে।

গত ৪ঠা মে নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত জোরানপুরে এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয়ে গেল। দাঙ্গায় তিনজন দরিদ্র তপশীলি হিন্দু নিহত হয় এবং আহতের সংখ্যাও অনেক। বহু মানুষের বাড়ি পুড়েছে এবং সর্বস্ব লুঠ হয়ে গেছে। এমন কি গরু-ছাগল পর্যন্ত। এতবড় ঘটনাটা নদীয়া জেলার বাইরে কেউ জানতে পারলো না। টিভি চ্যানেলগুলি বা দৈনিক সংবাদপত্রগুলো এই খবর দেখানোর বা ছাপানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষের এই বর্বরোচিত আক্রমণের খবর যাতে রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীর কাছে পৌঁছায় সেইজন্য হিন্দু সংহতি ৮ই মে বিকালে বৌবাজারের ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার মোড়ে এক পথসভার আয়োজন করে। কিন্তু কোন অজ্ঞাতকারণে প্রশাসন এই পথসভার অনুমতি দিতে রাজি হয়নি। পূর্ব রাতেই জয়েন্ট পুলিশ কমিশনারের পি.এ. সংহতি সভাপতিকে সভা বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। কিন্তু তপন ঘোষ দমবার পাত্র নন। প্রশাসনের বাধা সত্ত্বেও তিনি সভা করবেন বলে জানিয়ে দেন।

৮ তারিখ বিকাল চারটের মধ্যেই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ'তিনেক হিন্দু সংহতির কর্মী ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার মোড়ে উপস্থিত হয়। তারা বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সভাপতির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে মুচিপাড়া থানার ওসি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশের কাছ থেকে সভা না করার জন্য বারে বারে চাপ আসতে থাকে।

কিন্তু ৫টা নাগাদ সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতেই পরিস্থিতি বদলে যায়। সভাস্থল পুলিশ ব্যারিকেড করে দিলে তপনবাবু তাঁর কর্মীদের নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে লালবাজারের দিকে হাঁটতে শুরু করেন। এই মাস্টারস্ট্রোকের জন্য পুলিশ প্রস্তুত ছিল না। কিছু দূর যাওয়ার পর পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিল আটকালে সংহতির কর্মীরা সভাপতির নেতৃত্বে রাস্তা অবরোধ করে ওখানেই অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তপন বাবু খালি গলায় পথচলতি মানুষের কাছে নদীয়ায় মুসলমানের বর্বরোচিত আক্রমণের কথা তুলে ধরেন। প্রচুর সাধারণ মানুষও দাঁড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে পুলিশ জোর করে কর্মীদের হটিয়ে দিতে চাইলে সংহতি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতি বেঁধে যায়। ইতিমধ্যে মাইক এসে গেলে তপনবাবু মাইকে পুলিশের উদ্দেশ্যে বলেন যে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আজ প্রশাসন হিন্দু সংহতিকে করতে দিল না। এতে ভালোই হল। প্রশাসনও চাইছে হিন্দুরা হাতে পাথর লাঠি তুলে নিক, সংঘর্ষের পথে যাক্, তাহলেই বোধহয় প্রশাসন অনুমতি দেবে।

এরপর সংহতি সভাপতি বলেন, বিক্ষোভ মিছিল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যাবে। পুলিশ সংহতির দাবীর কাছে মাথা নত করে মিছিল যাওয়ার অনুমতি দেয়। মিছিল স্লোগান দিতে দিতে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে আসে। সেখানে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ ছাড়া সহ সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। জেলায় জেলায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচী চলবে বলে তপনবাবু জানান।

‘‘স্বাধীন ভারতের ভিত নির্মাণে গলদ’’

দ্বিতীয় পর্ব

তপন কুমার ঘোষ

গত সংখ্যায় আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম স্বাধীন ভারতের ভিত নির্মাণে যে গলদ হয়েছিল তা কেন হয়েছিল। ভিতের এই গলদ আমরা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ক্ষতিকারক চারটি উত্তরাধিকার আমি বর্ণনা করেছি ঃ ভেজাল, বার্ধক্য, বিশ্বাসঘাতকতা ও ডীল। এই চারটি নেতিবাচক বোঝা নিয়ে স্বাধীন ভারতের যাত্রা শুরু হল, শুরু হল নবীন ভারতের ভিত নির্মাণ।

এরপর ‘ডীল’-এর কথা। এই ডীলের মাধ্যমেই স্বাধীন ভারতের ক্ষমতার মূল চাবিটা এল জওহরলাল নেহেরুর হাতে। কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর থেকে যোগ্য ও জনপ্রিয় নেতা আরও অনেকে ছিলেন। বিশেষ করে দেশভাগের বিভীষিকার পর নেহেরু ও গান্ধীর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তখন কংগ্রেসের মধ্যে সব থেকে বলিষ্ঠ নেতা হিসাবে বিবেচিত হতেন। তাঁর আগেই তো নেতাজির মতো বলিষ্ঠ নেতাকে বিদায় করা হয়েছে। তাই স্বাধীনতার ঠিক প্রাক্কালে গান্ধী-নেহেরু ও মাউন্টব্যাটেনের চক্রান্তে নেহেরুকে কংগ্রেসের মাথায় বসিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্বর পদটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল। যেহেতু ‘ডীল’-এ নেহেরু প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তাই ‘ডীল’-এর শর্ত পূরণ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন। অর্থাৎ মাউন্টব্যাটেন বা ইংল্যান্ড যা বলবে তাই মানতে হবে। সেই শর্ত অনুসারে স্বাধীনতার পর গভর্ণর জেনারেল পদ বাতিল করা হল না এবং প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসাবে মাউন্টব্যাটেনই থেকে গেলেন। সেই সঙ্গে সেনাবাহিনীরও প্রধান। এর থেকে বোঝা যায় যে আমাদের স্বাধীনতা ছিল আংশিক।

দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে ভারতকে ‘কমনওয়েলথ’-এ (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন দেশগুলির গোষ্ঠী) থাকতে বাধ্য করা হল। তৃতীয় শর্ত, নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের অংশগ্রহণকারীদের পুনর্বহাল না করা। চতুর্থ শর্ত, ব্রিটিশ আমলে ঘটানো বহু অমানবিক কাজের তদন্ত না করা। উদাহরণ--- তেতাল্লিশের মন্বন্তর, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, ব্যারাকপুর নীলগঞ্জের হত্যাকাণ্ড এবং এইরকম বহু কুকীর্তি। এছাড়াও ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু গোপন শর্ত আছে যা আজও প্রকাশিত হয়নি। হাতে-পায়ে বেড়িবাঁধা অবস্থায় আমাদের যাত্রা শুরু হল যার কর্ণধার নেহেরু। নেহেরুর ছিল দুটি প্রধান ভয় (এ) যদি নেতাজি ফিরে আসেন, (দুই) কংগ্রেসের মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে নেতা নির্বাচন হলে সর্দার প্যাটেল প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন। এই দুটি প্রবল ভয় ছাড়াও নেহেরুর মানসিকতা ছিল হিন্দু বিরোধী, মুসলিম তোষণকারী, পাশ্চাত্যপ্রেমী ও রুশ ঘেঁষা বামপন্থী। এতগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ নেতাজির ফিরে আসার ভয়টাই সবথেকে প্রবল ছিল নেহেরুর মধ্যে। সেই আতঙ্কেই তিনি গিয়ে পড়লেন ব্রিটিশ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার খপ্পরে, মাউন্টব্যাটেন থেকে স্ট্যালিনের খপ্পরে। তাইহোকুর সাজানো বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত জাপান বা অক্ষশক্তি তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারেনি। মিত্রশক্তি আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া একজোটে যুদ্ধ করলেও যুদ্ধ শেষে একে অপরের সঙ্গে শত্রুতা করেও বিশ্বের বড় অংশের দখল নিতে তৎপর ছিল। ভৌগোলিক কারণে এশিয়া ভূখণ্ডে রাশিয়ার সুবিধা বেশি ছিল। তাই এটা প্রায় নিশ্চিত যে নেতাজি রাশিয়ার হাতে বন্দী হয়েছিলেন। অথবা এটাও হতে পারে যে পুঁজিবাদ বিরোধী শক্তি হিসাবে রাশিয়ার কাছে নেতাজি আশ্রয় চেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পরিপক্ক নেতাজী ভালোই জানতেন যে যদিও রাশিয়া-আমেরিকা, ইংল্যান্ড একসঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তবুও যুদ্ধশেষে ইংল্যান্ড থাকবে আমেরিকার দিকে এবং সোভিয়েত রাশিয়া হবে ইংল্যান্ড-আমেরিকার ঠিক বিপরীত মেরুতে। তাই হয়তো নেতাজি রাশিয়ার কাছে সহযোগিতার আশা করেছিলেন। কিন্তু নেতাজির একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি বুঝতেন, কিন্তু স্ট্যালিনের ক্ষমতালোভী নিষ্ঠুর ও সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার নিজের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের পাইকারী হারে নৃশংসভাবে হত্যা করতে যার হাত কাঁপেনি, সেই স্ট্যালিন যে নেতাজির মত বড় মাপের একজন নেতাকে হাতে পেয়ে রাজনীতিতে দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে শেষে খতম করে দেবেন— এটা নেতাজি বোধহয় বুঝতে পারেননি। তাই স্ট্যালিন নেতাজিকে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা না করে তাকে হাতে রেখে নেহেরুকে ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করলেন। নেতাজি ভারতে ফিরে আসার ভয়ে নেহেরু বাধ্য হলেন আমেরিকা-ব্রিটেন জোটে না গিয়ে রাশিয়ার জোটে যোগ দিতে। নেহেরুর উচ্চস্বরে ঘোষিত জোটনিরপেক্ষতা যে শুধু ভণ্ডামী ছিল এটা একজন শিশুও বুঝতে পারে। সুতরাং সোভিয়েত রাশিয়ার ভিতরে সাইবেরিয়ার নির্জনাবাসে চিরতরে হারিয়ে গেলেন আমাদের সুভাষ, আমাদের নেতাজি। আর ভারত হয়ে গেল সোভিয়েত রাশিয়ার কুক্ষিগত, নেহেরু এবং তার বংশধররা হলেন চিরকালের জন্য রাশিয়ার তাঁবেদার।

স্বাধীন ভারত, নতুন ভারতের ভিত নির্মাণের কাজ শুরু হল। একটা তুলনার কথা বারবার মনে আসে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও ধিক্কৃত হিটলার আত্মহত্যা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। জার্মানি হয়ে গেল বিধ্বস্ত। গোটা জার্মানিতে একটাও গোটা বাড়ি অবশিষ্ট ছিল না। জার্মানির সমস্ত ব্যবস্থা, সমস্ত পরিকাঠামো শুধু ভেঙে পড়েনি, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেই অবস্থায় পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর হলেন ‘কনরাড অ্যাডেনাওয়ার’, তিনি দায়িত্ব পেয়ে ঘোষণা করলেন, জার্মানির সব ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে। সব কিছুরই পুনঃনির্মাণ করতে হবে। কিন্তু সবথেকে আগে দরকার জার্মানির আধ্যাত্মিক পুনরনির্মাণ। সেই পশ্চিম জার্মানি পরে সোভিয়েত ধ্বংসের পর পূর্ব জার্মানির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পূর্ব জার্মানির অনুন্নয়নের বিরাট বোঝা টেনেও আজ বিশ্বের একেবারে প্রথম সারির প্রথমদিকে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদের দেশের কর্ণধার জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার জন্য লজ্জিত ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে কলকারখানা ও সেচের জন্য বাঁধই হবে আধুনিক ভারতের নতুন মন্দির, অর্থাৎ সম্পূর্ণ জড়বাদী চিন্তা নিয়ে ভারতের কর্ণধার ভারতের নবনির্মাণ শুরু করেছিলেন। আজ জার্মানির সঙ্গে ভারতের তুলনা করলে (মনে রাখতে হবে ভারত অনেক বেশি উর্বর ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ) সহজেই বোঝা যায় কে কতটা এগিয়েছে। কেন আমরা পিছিয়ে পড়লাম? কারণটা নিহিত আছে ঐ যাত্রা শুরু কালের কর্ণধারদের মানসিকতার তফাতে।

রুশ বিপ্লবের কিংবদন্তী নেতা লেনিন-এর জীবিতকালেই মাত্র চার বছরের মধ্যেই রাশিয়াতে সাম্যবাদী মার্কসবাদী মডেলের অর্থনীতির চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল, তাই ১৯২১ সালেই লেনিন রাশিয়াতে NEP নামে নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচি চালু করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাতেও সামলে দেওয়া যায়নি। শুধু কমিউনিস্ট পার্টির স্বৈরতন্ত্রের লৌহ শাসনে বিক্ষুব্ধ জনগণকে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্ট্যালিন, ও তাঁর উত্তরসূরীরা ছলে বলে পূর্ব ইউরোপের অনেকগুলি দেশ দখল করে, সেই সব দেশের সম্পদ ও কাঁচামাল লুঠ করে এনে রাশিয়ার শাসনযন্ত্রটাকে চালু রাখছিলেন ও বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের কাজে লাগাচ্ছিলেন। এইরকম পরিস্থিতিতে নেতাজিকে হাতে পেয়ে নেহেরুকে ব্ল্যাকমেল করে স্বর্ণগর্ভা ভারতকে শুষে নেওয়ার সুযোগ যে সোভিয়েত রাশিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা, স্ট্যালিন ও তার পরবর্তীরা ছাড়বেন না এটাতো স্বাভাবিক, তাই তাঁরা করেছেন। রাশিয়া যে কি পরিমাণে বহুভাবে ভারতকে শোষণ করেছে তার বর্ণনা অর্থনীতিবিদরা দেবেন। আমি শুধু একটি পরিসংখ্যানের উল্লেখ করছি। বিশ্বের সমস্ত দেশের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক লেনদেন ডলারে হলেও ভারত-সোভিয়েত বিশেষ চুক্তি অনুসারে ভারত-রাশিয়ার লেনদেন সোভিয়েতের মুদ্রা রুবলে হত। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে রাশিয়ান রুবলের দাম মাত্র পঞ্চাশ পয়সায় দাঁড়িয়েছিল, তখন ভারত প্রতি রুবলের মূল্য দিত ত্রিশ টাকা। অর্থাৎ রাশিয়াতে একশ রুবল দামের কোন জিনিস যখন বিশ্বের অন্যদেশে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হত, তখন আমরা সেই জিনিসটার দাম রাশিয়াকে দিতাম ১০০ × ৩০ = ৩০০০ টাকা। অকল্পনীয় শোষণ, অকল্পনীয় বঞ্চনা। কারণ নেহেরু এবং কংগ্রেসের সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে ব্ল্যাকমেল হওয়া, নেতাজি ফিরে আসার ভয়ে অথবা নেতাজির মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য ফাঁস করে দেবার ভয়ে।

সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে শুধু অর্থনৈতিক ভাবে শোষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। বিশ্বব্যাপী লাল সাম্রাজ্য স্থাপনের উদগ্র বাসনায় তারা ভারতের উপর তাদের কমিউনিস্ট মতবাদকেও চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই কাজে তাদের দোসর হয়েছিল তাদের পয়সায় লালিত-পালিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধীকে রাশিয়া বাধ্য করেছিল কেন্দ্রীয় সরকারি প্রশাসনের ও মন্ত্রীসভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বামপন্থীদের নিতে। তিনটি ক্ষেত্রে এর সর্বনাশা সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমাদের দেশে পড়েছে—শিক্ষা, অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা।

ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (ইনি কমিউনিস্ট ছিলেন না) একবর্ণ ইংরাজী বা সংস্কৃত জানতেন না। আরবী, ফার্সি ও ইসলামিক শাস্ত্রে ইনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর হাতে পড়ল স্বাধীন ভারতের শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরির ভার। দীর্ঘ প্রায় এগারো বছর ইনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পরে আবার কিছুদিনের জন্য হুমায়ুন কবীর ও ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ দেশের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। এই দুজনেরও কোন দেশভক্তি ছিল না। তারপর ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত মার্কমারা কমিউনিস্ট নুরুল হাসান শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা জামানায়। এছাড়াও শিক্ষা দপ্তরের ইতিহাস গবেষণা, সংস্কৃতি ও পাঠ্যক্রম তৈরির দপ্তরগুলিতে বিজাতীয় বামপন্থী মতাদর্শের ব্যক্তিদের ছিল রমরমা। ফলে শিক্ষার সমস্ত স্তর থেকে বাদ হয়ে গেল দেশের সম্বন্ধে স্বাভিমান ও গর্ববোধ তৈরির সমস্ত পাঠ্যসূচি। বাদ পড়ে গেল অতীত ভারতের সমস্ত গৌরব ও সাফল্যের কথা। বাদ পড়ল রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, বাদ পড়ল কণাদ, আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য। বাদ পড়ল কালিদাস, ভবভূতি। বাদ পড়ল ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শঙ্করাচার্য, বিদ্যারণ্যস্বামী। প্রায় বাদ পড়ল সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, শিবাজী, রাণাপ্রতাপ। সুপরিকল্পিত চক্রান্তে চেপে দেওয়া হল বিদেশী ও বিধর্মী আক্রমণের ছলচাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্মান্ধতা ও নৃশংসতার কাহিনীগুলি। সর্বমোট ফল—এক স্বাভিমানশূন্য, আত্মসম্মানহীন নতুন প্রজন্ম তৈরি হল। এ ক্ষতি বাটখারা বা ইঞ্চি স্কেল দিয়ে মাপা যায় না, এ ক্ষতি পূরণ হতে অনেক সময় লাগবে।

প্রথমেই আমাদের সংবিধান তৈরি হল সম্পূর্ণ বিদেশী ধাঁচে। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হওয়া ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া অ্যাক্টকে ভিত্তি করে ও বিশ্বের আরও কয়েকটি পশ্চিমী দেশের সংবিধান থেকে নিয়ে এখানে ওখানে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি হল স্বাধীন ভারতের সংবিধান যার সাথে ভারতের সমাজ ও আত্মার কোন যোগ নেই। যোগ নেই ভারতের মানুষের সামূহিক আশা আকাঙ্খার, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির ও ভারতীয় মূল্যবোধের। তাইতো এই সংবিধান ইতিমধ্যেই একশবার সংশোধন করতে হয়েছে।

এরপর অর্থনীতি। প্রায় হাজার বছর ধরে লুণ্ঠিত শোষিত একটা বিশাল দেশের অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। তারজন্য দেশের বিশালতার ধারণা, গ্রামে দারিদ্র্যের গভীরতা সম্বন্ধে যে বাস্তব জ্ঞান থাকা দরকার তা নেহেরুর ছিল না। জীবনে কখনও গ্রামে বসবাস করেননি। আর দূরদৃষ্টি ছিল না। ফাঁপা কল্পনাবিলাস ছিল। তাই তৎকালীন গ্রামপ্রধান (৯০ শতাংশ গ্রামবাসী) ভারতে গ্রাম ও কৃষির উন্নতি দিয়েই যে অর্থনীতির চওড়া ভিত নির্মাণ করতে হবে, সে ধারণা বা বিশ্বাস নেহেরুর ছিল না। বিলাতফেরত বিলাতী মানসিকতার নেহেরুর চোখে উন্নত শহরভিত্তিক সভ্যতা ও অর্থনীতির স্বপ্ন ছিল। আবার অন্যদিকে ছিল সাম্যবাদের মোহ। আরও একটা কথা আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, যে কথায় অনেকেই আপত্তি করবেন, তা হল, নেহেরুর অবচেতন মনে ছিল রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা। দেশের সেবক হিসাবে নয়, দেশের রাজা হিসাবে দেশকে চালাতে চেয়েছিলেন। আর আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছে রাজতন্ত্র অপরিচিত ছিল না, এবং অনেকেই এই রাজতন্ত্রের অধীনে প্রজা হিসাবে থাকতে ভালবাসতেন। তাই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাজতান্ত্রিক মানসিকতা ও আচরণ অনেকের কাছেই স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। নেহেরুর এই রাজতান্ত্রিক মানসিকতার জন্যই অর্থনীতিতে সোভিয়েত মডেলটা তাঁর পছন্দ হয়েছিল। কারণ কমিউনিস্ট অর্থনীতি হচ্ছে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। সুতরাং দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণটা তাঁর হাতেই থেকে যাবে ওই মডেল অনুসরণ করলে। সুতরাং নেহেরুর রাজতান্ত্রিক মানসিকতার সঙ্গে সাম্যবাদী মডেলটা বেশ মিলে গেল। তাছাড়া নেতাজি রাশিয়ার কব্জায় থাকায় নেহেরুর উপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ তো আছেই। তাই, নেহেরু ভারতের অর্থনীতির ভিত নির্মাণ শুরু করলেন রাশিয়ার মডেলে। সেই মডেলের প্রথম ও শেষ কথা সরকারী নিয়ন্ত্রণ। ভাষান্তরে, লাইসেন্স-পারমিট-লাল ফিতের রাজ। সরকারের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া কেউ কিছু তৈরি করতে পারবে না। ভারতের অর্থনীতিকে গোড়াতেই পঙ্গু করে দেওয়া হল। বিশদ বর্ণনা করে বলার জায়গা এটা নয়। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব। আজকের প্রজন্মের যুবকেরা বোধহয় কল্পনাও করতে পারবে না, একটা বাজাজ স্কুটার কেনার জন্য নাম লিখিয়ে পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হত। নেহেরুর মহান সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিণাম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির শ্লোগান দিয়ে, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির ডাণ্ডা দিয়ে দেশের উৎপাদনকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছিল। উৎপাদন ও গুণমানের প্রতিযোগিতাকে স্তব্ধ করে রাখা হয়েছিল। পরিণামে দেশের অর্থনীতি হয়ে গেল পঙ্গু। আর মুষ্টিমেয়

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩ পাতার শেষাংশ

''স্বাধীন ভারতের ভিত নির্মাণে গলদ''

নেহেরু-পছন্দ শিল্পপতিরা পেলেন সংরক্ষিত বাজার। এই অর্থনীতি সারা বিশ্বে ব্যর্থ বলে অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৯১-৯৬ সময়কালে কংগ্রেসেরই নরসিংহ রাও-এর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ভারত ওই ভুয়ো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ফাঁস থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাঁর পরবর্তী প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রীই তাঁর মুক্ত অর্থনীতির পথ অনুসরণ করেছে ও করছেন।

এছাড়াও নেহেরুর অর্থনীতির আর একটা খুব বড় খারাপ দিক ছিল গ্রাম ও কৃষিকে গুরুত্ব কম দেওয়া। তিনি দেশে কয়েকটি বড় বড় ইস্পাত কারখানা রাশিয়ার সহযোগিতায় করেছিলেন। তাতে ভারতের থেকে হয়তো রাশিয়া বেশি লাভবান হয়েচে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হল, গ্রামপ্রধান ও কৃষিপ্রধান দেশে গ্রামের ও কৃষির উন্নতি না হলে বিরাট সংখ্যার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে না। ফলে জাতীয় অর্থনীতির প্রশস্ত ভিতটাই তৈরি হবে না। ঠিক তাই হয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে। গ্রামের অনুন্নয়ন, কৃষিতে লোকসান গ্রামের মানুষকে শহরের দিকে ঠেলছে। নিঃস্ব মানুষের এই ভিড় শহরীকরণকে প্রসারিত করতে পারেনি। শহরের বস্তি বৃদ্ধি হয়েছে। শহর হয়েছে আরও ঘনবসতিপূর্ণ, ঘিঞ্জি ও নোংরা। ফলে ভারত বিশ্বের চোখে হয়েছে হেয়।

নেহেরুর এই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ভারতকে চরম অনুন্নয়নের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বার্ষিক উন্নয়নের হার ৩ শতাংশ বা তার নীচে থেকেছে, যেখানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে এই হার ৬ বা ৮ বা তারও বেশি ছিল। ভারতের এই ৩ শতাংশ উন্নয়নের হারকে বিশ্বে 'হিন্দু রেট অফ গ্রোথ' বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এর অর্থ হল, হিন্দুদের যোগ্যতাই হল বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মানুষের যোগ্যতার থেকে অনেক কম। অর্থাৎ বিশ্বে ভারতকে ও হিন্দুকে চরম হেয় করা হয়েছিল। কিন্তু এখন আর ওই 'হিন্দু রেট অফ গ্রোথ'-এর কথা কেউ বলে না। কারণ, নরসিংহ রাও-এর সময় থেকে শুরু হওয়া মুক্ত অর্থনীতিতে বার্ষিক উন্নয়নের হার ৬ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত হচ্ছে। তখন হত না, এখন কি করে হচ্ছে? ভারত সেই হিন্দুপ্রধানই তো আছে! তাই স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ৪৪ বছর (১৯৪৭-১৯৯১) ভারতের অর্থনীতির সার্বিক ব্যর্থতা ও শ্লথগতির জন্য কী হিন্দুদের অযোগ্যতা দায়ী ছিল? এর জন্য একমাত্র দায়ী ছিল নেহেরুর তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক মডেল, বা লাইসেন্স পারমিট রাজ। তাই ভারতের ওই শ্লথগতির উন্নয়নের হারকে 'হিন্দু রেট অফ গ্রোথ' না বলে 'নেহেরু রেট অফ গ্রোথ' বলাই উচিত।

নেহেরুর মডেল অনুসরণ করে ভারতের অর্থনীতি একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। ষাটের দশকের শেষের দিকে আমেরিকা থেকে জাহাজ ভর্তি সাদা গম না আসলে মধ্যবিত্তরাও খেতে পেত না। তাহলে গ্রামে গরীবের অবস্থা যে কি শোচনীয় ছিল তা কল্পনা করা যায়। তখন ইন্দিরা গান্ধী কিছু বৈজ্ঞানিককে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে দেশের কৃষিতে সবুজ বিপ্লব আনলেন। ভারতের কয়েকটি কৃষি এলাকা বেছে নিয়ে সেখানে তা প্রয়োগ করা হল। যার মধ্যে আমাদের বর্ধমান জেলাও পড়ে। দেশের সার্বিক অন্নাভাব দূর হল। মানুষ একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

নেহেরুর এই ভুল অর্থনৈতিক মডেল তৈরিতে দোসর ছিলেন আমাদের এক বাঙালি। তাঁর নাম প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি নিজে অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন পরিসংখ্যানবিদ্ (Statistician)। ভারতের প্রথম ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট তৈরিতে তাঁর অবদান আছে। তাঁরই আমদানি করা রাশিয়ার ধাঁচের মডেল যা মহলানবিশ মডেল নামে পরিচিত, চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে। সেই মডেলও নেহেরুর অর্থনীতি আগেই বিদায় করা হয়েছে। আর আমাদের বর্তমান সাহসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাকে ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি প্ল্যানিং কমিশনও ভেঙে দিয়েছেন, পঞ্চমবার্ষিকী যোজনাও বন্ধ করে দিয়েছেন।

নতুন ভারতের ভিত নির্মাণে আর একটা খুব বড় গলদ থেকে গিয়েছিল। তা ছিল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে। এমনিতেই নেহেরু ছিলেন স্বপ্নবিলাসী। তাই দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় মজবুত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তিনি মনোযোগী ছিলেন না। তাছাড়াও তাঁর মধ্যে বিশ্বনেতা হওয়ার মোহ জোরালো ভাবে তৈরি হয়েছিল। তাই ভারতের প্রতিবেশী দুটি বড় দেশের, পাকিস্তান ও চীন, ভারতের প্রতি শত্রুসুলভ ও আগ্রাসী মনোভাব তিনি দেখতে পেলেন না। উল্টে কমিউনিস্ট চীন, বিশাল দেশ চীন। সেই চীনের কাছ থেকে হাততালি পেলে বিশ্বনেতা হওয়াটা সহজ হবে। তাই কমিউনিস্ট চীনের সামরিক প্রস্তুতি না দেখে নেহেরু 'হিন্দি-চীনী ভাই ভাই' ও পঞ্চশীল নীতি নিয়ে প্রচারের বেলুন ওড়াতে লাগলেন। ১৯৫৮ সালে চীন চরম সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে তিব্বত দখল করল। তিব্বত ভারতের প্রতিবেশী, ভারতের অতি পুরনো বন্ধু। যুগ যুগ ধরে আধ্যাত্মিক ভারত ও দার্শনিক ভারতের ছাত্র তিব্বত। সেই তিব্বতকে রক্ষা করা আমাদের মানবিক কর্তব্য তো ছিলই, আমাদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেও তা খুব দরকার ছিল। কারণ তিব্বত ছিল ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী দেশ। একে বলা হয় বাফার স্টেট। এবং তা আমাদের অন্ততঃ তিন হাজার বছরের বন্ধু রাজ্য। সেই দেশ চীনের হাতে চলে গেলে চীন ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলবে, যা কখনই অভিপ্রেত নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক নেতা হওয়ার স্বপ্নে বুঁদ নেহেরু ভারতের প্রতিরক্ষার এই বড় বিপর্যয়ের দিকটি দেখলেন না। চীনের হাততালি তাঁর কাছে ভারতের নিরাপত্তা ও তিব্বতের প্রতি আমাদের কর্তব্যের থেকেও বড় হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার বজ্রমুষ্ঠি নেহেরুর উপর আরও চেপে চেপে বসেছে। তাই রাশিয়ার চাপে তিনি ১৯৫৭ সালে একজন কমিউনিস্টকে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করলেন। তাঁর নাম কৃষ্ণমেনন। তিনি মন্ত্রী হয়েই দেশের ডিফেন্স ফ্যাক্টরীগুলোতে হারিকেন, কফি-মেশিন ইত্যাদি তৈরি করা শুরু করে দিলেন। ফলে ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে না আছে উন্নতমানের কামান-বন্দুক, না আছে গোলাগুলির স্টক। এমনকি হিমালয় পাহাড়ে যুদ্ধ করার জন্য যে শীতবস্ত্র ও জুতো-মোজা লাগে, সেটুকুও নেহেরু-কৃষ্ণমেননরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তৈরি বা সংগ্রহ করতে দেননি। ফলে ৬২-র যুদ্ধে আমাদের হাজার হাজার সেনা নিরস্ত্র অবস্থায় বেঘোরে মারা পড়েল। এক ধাক্কায় নেহেরুর হিন্দি-চীনী ভাই ভাই স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। নেফা (বর্তমানে অরুণাচল) থেকে আমাদের সেনাবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, আসামের তেজপুর থেকে লোক পালিয়ে যাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেদিনি ছিল আমাদের এক চরম লজ্জার দিন, অপমানের দিন। যুদ্ধশেষে হিমালয়ে আমাদের ১৪ হাজার বর্গ কি.মি. জমি চীনের হাতে চলে গেল। ভারতের এই সর্বনাশ, এই অপমান হল শুধু নেহেরুর স্বপ্নবিলাসিতা, বাস্তববিমুখীনতা, গদির লোভ ও আন্তর্জাতিক নেতা হওয়ার লোভে। চীনের এই ধাক্কায় নেহেরু হয়ে গেলেন পক্ষাঘাত আক্রান্ত। দেশদ্রোহী কৃষ্ণমেননকে সরতে হল প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে। তারপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হলেন দেশপ্রেমিক ও অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক বাবু জগজীবন রাম। বিহারের অত্যন্ত অনগ্রসর মুচি জাতিতে জন্ম নেওয়া এই যুব অল্পদিনের মধ্যেই দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অনেকটা মজবুত করে তুললেন। ১৯৬৪তে মারা গেলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত নেহেরু। প্রধানমন্ত্রী হলেন উত্তরপ্রদেশের অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়া লালবাহাদুর শাস্ত্রী। অতি ক্ষুদ্র আকৃতির ধুতি পরা (নেহেরু জীবনে ধুতি পরেননি) এই মানুষটির চরিত্র ছিল পাথরের মত শক্ত, দেশপ্রেম ছিল সোনার মত উজ্জল।

১৯৬২তে চীনের কাছে ভারতের অত্যন্ত লজ্জাজনক পরাজয় দেখে ভারতের জন্মশত্রু (চিরশত্রু কিনা তা ভবিষ্যতের ইতিহাস বলবে) পাকিস্তান উৎসাহিত হয়ে আমেরিকার মদতে ১৯৬৫ সালে ভারত আক্রমণ করল।কিন্তু তাদের বিধি বাম। তারা বুঝতে পারেনি যে ভারতের শনির দশা কেটে গিয়েছে। নেহেরু নামক রাহুগ্রাস থেকে ভারত মুক্তি পেয়েছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী, জগজীবন রাম ও মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে (তখন মোরারজী অর্থমন্ত্রী ছিলেন) মাত্র দু-আড়াই বছরের ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়ে গিয়েছে। আর ভারতের সেনাবাহিনীর সাহস ও দক্ষতা তো বিশ্বে অতুলনীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে তা প্রমাণিত। কৃতজ্ঞ ইংল্যান্ড আজও তা স্মরণ করে চলেছে। তাই, নেহেরু মুক্ত এই নতুন ভারত ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিল। আমরা বিপুলভাবে জয়ী হলাম। কিন্তু তারপরেই পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার নামে রাশিয়া লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে তাসখন্দে টেনে নিয়ে গিয়ে জোর করে তাসখন্দ চুক্তি করালো এবং লালবাহাদুরকে হত্যা করল। কারণটা সহজবোধ্য। লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে কোন লোভ দেখিয়ে কেনা যাবে না, নেহেরুর মত তাঁকে ব্ল্যাকমেল করা যাবে না। ফলে তাঁকে দিয়ে ভারতের ক্ষতি করে রাশিয়ার স্বার্থসিদ্ধি করা যাবে না। অবশ্য প্রচার করা হল যে তাসখন্দের ঠাণ্ডায় মদ্যপান না করার জন্য লালবাহাদুরের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ভারতবাসী জানে, একথা সর্বৈব মিথ্যা।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর নেহেরু কন্যা ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হলেন। এজন্য নেহেরু মৃত্যুশয্যা থেকেই গুটি সাজিয়ে গিয়েছিলেন। ইন্দিরা নিজে বাবার থেকে অনেকবেশি দেশপ্রেমিক, বাস্তববাদী ও সাহসী ছিলেন। কিন্তু নেহেরুর জীবনের কৃষ্ণগহ্বরগুলি (বিশেষ করে নেতাজীকে নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে গোপন ডীল) তো ঢেকে রাখতে হবে। নাহলে তো ইন্দিরারই গদি বিপন্ন হবে। তাই তিনিও রাশিয়ার খপ্পর থেকে বের হতে পারলেন না। পরবর্তীতে রাজীব গান্ধীর ক্ষেত্রেও সেই একই বাধ্যবাধকতা। ফলে এই নেহেরু পরিবার যতদিন ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে, ততদিন ভারতকে খেসারত দিতে হবে।

এই হল স্বাধীনতার পর নতুন ভারতের ভিত নির্মাণের গোড়ায় গলদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। নেহেরুর মৃত্যুর পর থেকেই সেই গলদ সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু নেহেরু পরিবার ও সেই পরিবারের বশংবদরা (বাজপেয়ী সহ) দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল বলে সেই সংশোধন খুব ধীরগতিতে হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। গান্ধী-নেহেরু-মার্কসবাদ ও ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতার বিষ যত কাটবে দেশের ততই মঙ্গল হবে। কিন্তু ততদিন দেশকে বাঁচানো যাবে কিনা, দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করা যাবে কিনা—তা ভবিষ্যতই বলবে।

...সমাপ্ত

ভালো নেই শিবাণী, ভগবতীরা....

মনে পড়ে শিবাণী সাঁপুইকে। দু'বছর আগে পুকুর থেকে জল তোলার অভিযোগে তার উপর নৃশংস অত্যাচার করেছিল মুসলমানেরা। গুরুতর অসুস্থ হয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। বাসন্তী থানায় অভিযোগ করতে গেলে সেখানেও তার ভাগ্যে ঘটে চরম দুর্ভোগ। থানার মেজবাবু শেখ খালেক শিবাণী দেবীকে চুলের মুঠি ধরে কিল-চড়-ই শুধু মারেনি, তাকে ফেলে বুকেও লাথি মারে। এরজন্যও দীর্ঘদিন তাকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়েছিল এবং পরবর্তী কালেও তাকে নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। এর প্রতিকার কি কোনদিন হবে?

বাসন্তী থানার অন্তর্গত তেঁতুলতলা গ্রামের (পোঃ-হাড়ডাঙি) সেই শিবাণী সাঁপুই আজও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। দু'বছর আগে অত্যাচারের পর হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় বাসন্তী থানায় একটি কেস দায়ের করা হয় প্রতিবেশী মুসলমানদের নামে। যে অফিসার থানার মধ্যে শিবাণীকে মেরেছিল, উপরতলার চাপে তাকে বদলিও করা হয়। এতে এলাকার মুসলমানেরা কিছুটা হলেও দমে যায়। সম্প্রতি তারা নতুন করে আবার অত্যাচার শুরু করেছে। বাগানের গাছপালা নষ্ট করে দেওয়া, রাস্তাঘাটে গালাগাল দেওয়া, মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, এমনকি প্রাণে মারার হুমকিও তারা দেয়। এদের ভয়ে তড়িঘড়ি শিবাণী দেবী তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। শিবাণী দেবী এই প্রতিবেদনের প্রতিনিধিকে জানায়, মেয়ে এক-দু দিনের জন্য বাপের বাড়ি এলে দুষ্কৃতিরা বাড়ির আনাচে-কানাচে রাতের বেলা ঘুরে বেড়ায়। তাদের ভয়ে রাত জেগে পাহারা দিতে হয়। একাধিক বার থানায় রিপোর্ট করা সত্ত্বেও, থানা থেকে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। আসলে গরীব, হিন্দু দেহাতি মানুষগুলোর কথা শুনবার মতো ফুরসৎ প্রশাসনের নেই।

একই অবস্থা রায়দিঘির ভগবতী হালদারের। কিছুদিন আগে খাস জমি দখল করে এলাকার মুসলমানরা দোকানঘর তৈরি করতে গেলে ভগবতী হালদারের নেতৃত্বে এলাকার সাধারণ মানুষ বাধা দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানরা ভগবতীর উপর চড়াও হয়ে মারধোর করে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আরও কয়েকজন গ্রামবাসী আহত হয়। তাদের প্রত্যেককেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘদিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও ভগবতী এখনও সুস্থ নন। কিন্তু সেদিনের সেই প্রতিরোধের ফলে মুসলমানরা খাস জমি দখল আর দোকানঘর তৈরি করতে পারেনি। তাই তাদের যত রাগ ভগবতী হালদারের উপর। সম্প্রতি রাগ মেটাতে আশপাশের মুসলমানেরা ভগবতীর সবজি বাগানের সমস্ত গাছ কেটে বাগান তছনছ করে দেয়। তাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এলাকাটি সংখ্যালঘু

অধ্যুষিত হওয়ার ভয়ে হিন্দুরা কাঁটা হয়ে থাকে। এতবড় অন্যায় দেখেও তারা প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। পুলিশ- প্রশাসনকে বহুবার জানানো সত্ত্বেও কোনো লাভ হয়নি (থানা এলাকাটি থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে)। এমন অবস্থায় ভগবতীরা নিজেদের লড়াই নিজেরাই লড়বে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রাণ থাকতে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি তারা ছাড়বে না—ভগবতীরা একথা প্রশাসনকেও জানিয়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

ধামরাইয়ে গণধর্ষণের শিকার তরুণী

ধামরাইয়ে এক তরুণী গণধর্ষণের শিকার। মুমূর্ষ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসি-তে চিকিৎসাধীন রয়েছে ধর্ষিতা। ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশের ঢাকা সংলগ্ন উপজেলা রোয়াইল ইউনিয়নের দক্ষিণ খরারচড় গ্রামে।

জানা যায়, ধামরাইয়ে এক তরুণী বৈশাখী মেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এলাকাবাসী জানায়, উপজেলার রোয়াইল ইউনিয়নের দক্ষিণ খরারচড় গ্রামের এক দিনমজুরের মেয়ে (১৬) স্থানীয় দধিঘাটা গ্রামে বৈশাখী মেলা ও ঠাকুর দেখতে যায়। মেলা শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে কাংসা ব্রীজের কাছে বহুতকুল গ্রামের সলিমউদ্দিনের ছেলে ইয়া হিয়া (২৩) ও সেনাইল গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে আবদুর রাজ্জাক (২৪) তার গতিরোধ করে। এরপর ঐ তরুণীর মুখ ও হাত-পা বেঁধে খরার চড় গ্রামের মাদ্রাসার উত্তর পাশে নির্জন স্থানে নিয়ে রাতভোর ধর্ষণ করে। তরুণী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে সেখানে ফেলে রেখে চলে যায় ধর্ষণকারীরা। পরে মেয়েটির গোঙানি ও কান্নার শব্দ শুনে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। লোকলজ্জার ভয়ে তরুণীর পরিবার প্রথমে তার বাড়িতেই চিকিৎসা করে। কিন্তু মেয়েটি প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে অচেতন হয়ে পড়লে স্থানীয় একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেও তার অবস্থার কোন উন্নতি না হলে চিকিৎসকের পরামর্শে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়। বর্তমানে মুমূর্ষ অবস্থায় সেখানে তরুণীটি চিকিৎসাধীন।

ঐ অঞ্চলের থানার অফিসার ইনচার্জ ফিরোজ তালুকদার জানান, এ বিষয়ে কোন অভিযোগ থানায় জমা পড়েনি। দুষ্কৃতিদের শাসানিতে দিনমজুর পরিবার ভয়ে কোন অভিযোগ করতে পারেনি। অভিযোগ পেলে আসামীদের গ্রেপ্তার করা হবে। ধর্ষক নরপশু ইয়াহিয়া ও রাজ্জাক পলাতক।

মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মামলা গ্রেফতার দুই

গত ১৪ই এপ্রিল শুভ নববর্ষের দিনে বাংলাদেশের নীলফামারীর ডিমলায় পোস্টার লাগিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের হুমকি দেয় সংখ্যাগুরু মুসলিমরা। পরে একটি দুর্গামন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা। মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার খালিশাচাপালী ইউনিয়নের কাকিনা চাঁপানী সার্বজনীন দুর্গমন্দিরে এ ঘটনা ঘটে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও কাকিনা চাঁপানী গ্রামের অন্তত চারশো হিন্দু পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। স্থানীয়রা জানায়, ভোরে মন্দিরে আগুন দেখতে পাওয়া যায়। এলাকাবাসী দ্রুত এই আগুন নেভাতে সক্ষম হলেও মন্দিরের সামনে বাঁশের বেড়াটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ঘটনার সময় গ্রামবাসীরা মন্দিরের দেওয়ালে সাঁটানো দুটি পোস্টার দেখতে পায়। পোস্টারে লেখা ছিল—জামাত শিবির বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। পূজা-পার্বণ চলবে না। হরি মন্দির, দুর্গামন্দির থাকবে না। হিন্দু বেটা পালাও ভারতে....ইত্যাদি।

দুর্গামন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার ভিত্তিতে পুলিশ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে। এরা হলেন খালিশা চাঁপানী ইউনিয়নের খালিশা চাঁপানী গ্রামের ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোতালেব হোসেন (৫০) এবং আজিজুল ইসলাম (৩৫)। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আদালতে ৫ দিনের রিমাণ্ড চেয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সরব শিল্পী

শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা'র জন্য ভারতে স্থায়ী বসবাসের একটা ব্যবস্থা করে রাখা দরকার। কোন রাজ্য স্যুটেবল হতে পারে? পশ্চিমবঙ্গ তো একবার তসলিমাকে তাড়িয়েছে। তখন রাজস্থান-গুজরাট তাঁকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। রেজওয়ানা চৌধুরীর জন্য এদেশে কোন রাজ্যের দরজা খোলা আছে তাই দেখার।

মাদ্রাসায় সাহায্য না করতে প্রবাসীদের আহ্বান জানালেন শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। লন্ডনে গান গাইতে এসে ধর্মীয় আবেগে আঘাত করে গেলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। তিনি বলেছেন, মাদ্রাসায় পড়ে মুক্ত মনের মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। তিনি কবিগুরুর মর্মবাণী আত্মসম্মান ও আত্ম-নির্ভরতার আদর্শ শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি প্রবাসীদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা মাদ্রাসাকে সাহায্য না করে যেসব প্রতিষ্ঠান মুক্তিবুদ্ধি ও মুক্তিচিন্তা চর্চা শেখায় সেখানে দান করলে সমাজে উদারনৈতিক মানুষ সৃষ্টি হবে।'

বাগেরহাটে মন্দিরে ভাঙচুর -অগ্নিসংযোগ

গত ১১ই এপ্রিল বাংলাদেশের বাগেরহাটের মোল্লাহাটে একটি মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। শনিবার ভোরে উপজেলার আটজুড়ি ইউনিয়নের কাঠাজোড়া গ্রামের বিশ্বাস বাড়ির সার্বজনীন দুর্গামন্দিরে এ ঘটনা ঘটে।

মোল্লাহাট থানার ওসি আনম খায়রুল জানান, শুক্রবার রাতে কোন একসময়ে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুর করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে দুর্গাপ্রতিমাসহ বেশ কয়েকটি প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমৃত বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেন, ভোররাতের দিকে দুর্বৃত্তরা মন্দিরে ঢুকেছিল। প্রথমে তারা দুর্গা প্রতিমাসহ অন্যান্য প্রতিমাগুলি ভেঙে দেয়। তারপর কোন দাহ্য পদার্থ ঢেলে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ভোরের দিকে মন্দির থেকে আগুন বেরুতে দেখে আমরা সেখানে গিয়ে আগুন নেভাই।

ওসি আনম খয়রুল বলেন যে, সম্প্রতি মন্দিরের জায়গাসহ ২০ শতাংশ জমি কেনাবেচা নিয়ে চিতলমারী উপজেলার রাসেল শেখ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে মন্দির কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে বিরোধ তৈরি হয়েছে। ওই বিরোধের জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে তার ধারণা।

হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ-ধর্মান্তরের পর বিয়ের অভিযোগ

লালমনিরহাটে এক হিন্দু মেয়েকে অপহরণ করে ধর্ষণ এবং তারপর ধর্মান্তর করে বিয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আদিতমারী উপজেলার ভেলাবাড়ি ইউনিয়নের মাঝিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার প্রতিবাদে অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে আদিতমারী থানায় একটি মামলা করেছে সংশ্লিষ্ট পরিবারটি। কিন্তু মামলা তুলে নিতে হুমকি দেওয়া হচ্ছে অপহরণকারীদের পক্ষ থেকে। অপহরণকারীর প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের আটক করছে না বলে অভিযোগ করেছে ওই পরিবার।

আমাদের লালমনিরহাট প্রতিনিধি জানিয়েছেন, গত ২ মে অপহৃদ মেয়েটির পরিবার আদিতমারী থানায় বুলেট মিয়া ওরফে ভুলু, আমিনুল ইসলাম, বাবলু মিয়া ও আজিজুল ইসলামকে আসামী করে একটি মামরা করে। মামলার বর্ণনা অনুযায়ী গত ২৯ এপ্রিল আমিনুল ইসলাম ও আজিজুল ইসলামের সরাসরি সহযোগিতায় বুলেট মিয়া ওরফে ভুলু ও বাবলু মিয়া মিনতি রাণী দাস (কল্পিত নাম) নামের ওই মেয়েক অপহরণ করে।

এরপর সদর উপজেলার ফারিঙ্গার দিঘী গ্রামের একটি বাড়িতে আটকে রেখে তাকে ধর্ষণ করা হয়। এরপ সংবাদ পেয়ে মেয়েটির রপিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধারে পুলিশের সাহায্য কামনা করে। কিন্তু পুলিশ অন্য কাজে ব্যস্ত আছে বলে তাদের সাহায্যের অস্বীকৃতি জানায়। পরে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু অপহরণের দিনই অপহরণকারী ভুলু এফিডেফিটের মাধ্যমে মিনতি রাণী দাসকে মিনা খাতুন (কল্পিত) নামে ধর্মান্তর করে বিয়ে করে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মিনতি এসবের কিছুই জানেন না। সবকিছুই তার অজান্তেই করা হয়েছে।

এদিকে, গত ৫ মে মেয়েটিকে উদ্ধার করে মেয়েটিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পুলিশ পরেরদিন মেয়েটিকে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য সদর হাসপাতালে পাঠায়। বর্তমানে মেয়েটিকে তার বাবা-মা নিরাপদ স্থানে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন।

কিন্তু অভিযুক্তরা মামলা তুলে নিতে পরিবারটিকে নানাভাবে হয়রানি করছে বলে মিনতির পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। তারা বলেছেন, অভিযউক্তরা প্রাকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের আটক করছে না। এ ব্যাপারে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই জাফর ইকবাল জানান, অভিযুক্তরা এখন নিখোঁজ রয়েছে, সেজন্য তাদের আটক করা যাচ্ছে না।

এদিকে, ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে আদিতমারী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আসলাম ইকবাল জানান, পুলিশ অভিযুক্তদের আটকের চেষ্টা করছে। তবে মিনতির পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, অভিযুক্তরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৪টি মন্দিরে ৭টি প্রতিমা ভাঙচুর করলো ইসলামের দুষ্কৃতিরা ঃ গ্রেফতার ১

পিরোজপুর কাউখালিতে বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল ২০১৫) শ্রীশ্রী মদনমোহন জিউর আখড়াবাড়ি কেন্দ্রীয় দুর্গামন্দিরে ৪টি প্রতিমাসহ সিরিজ আকারে বিভিন্ন মন্দিরে ৭টি প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা।

এই কাজে যুক্ত মিনু খানম নামে এক মহিলাকে মন্দিরের ভক্তরা আটক করে বেদম মারধোর করে। জানা যায়, কেন্দ্রীয় মন্দিরের দুর্গাপ্রতিমা সহ সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশ প্রতিমাও ভেঙে দেয়। দুর্বৃত্তরা শ্মশানের শ্রীশ্রী কালী প্রতিমা ও লোকনাথ মন্দিরের লোকনাথের বিগ্রহ এবং ১লা বৈশাখ উপলক্ষে নাথ মন্দিরের নবনির্মিত বিশালাকৃতির গণেশ প্রতিমাটিও ভেঙে দেয়। দিনেদুপুরে কাউখালী উপজেলার থানার পাশে এরকম একটি ঘটনা সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে। ভক্তরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেথাকলে উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শহীদুল ইসলাম, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ ব্যাপারে উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শহীদুল ইসলাম জানান বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং সেইমতো আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। থানা আধিকারিক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, ঘটনাটি কোন সুস্থ মানুষের কাজ নয়। আটক মহিলাকে পুলিশ হেফাজতে কাউখালী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মহিলা সুস্থ হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিষয়টি তদন্ত করে সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিএসএফ-পাচারকারী সংঘর্ষ ঃ নিহত দুই বাংলাদেশী

চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও গরুপাচারকারীদের সংঘর্ষে দুই বাংলাদেশী গরু পাচারকারী নিহত হয়েছে। নিহতরা হল উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের খড়িয়াল গ্রামের গুলার হোসেনের ছেলে শরিফ (২৫) ও তারাপুর ঠুঠাগ্রামের মৃত সাহেব আলীর ছেলে আব্দুল হাকিম (৩৮)।

ঠুঠাপাড়া গ্রামের হাকিম ও খড়িয়াল গ্রামের শরিফ দীর্ঘদিন ধরে চোরাপথে ভারত থেকে গরু নিয়ে যায় বাংলাদেশে। গত ১৪ই এপ্রিল, মঙ্গলবার গভীর রাতে আরও কয়েকজন গরু ব্যবসায়ীর সঙ্গে চোরাপথে ভারতে ঢোকে হাকিম ও শরিফ। বুধবার ভোর রাতে ভারত থেকে গরু নিয়ে সীমান্ত পেরুনোর সময় ঘটনাটা বিএসএফ-এর নজরে আসে। ঠাকুলবাড়ি ক্যাম্পের বিএসএফ-এর সদস্যরা চোরাচালানকারীদের দাঁড়াতে বললে তারা অতর্কিতে বিএসএফ জওয়ানদের আক্রমণ করে বসে। বেকায়দায় পড়ে জওয়ানরাও গুলি চালাতে বাধ্য হয়। তাদের ছোঁড়া গুলিতে হাকিম ও শরিফ গুরুতর জখম হয়। আহত হাকিমের কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হলেও শরিফ সঙ্গীদের সঙ্গে পালিয়ে যায়। সেখানে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে বুধবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ তার মৃত্যু হয়।

বিএসএফ-এর হাতে গরু চোরাকারবারীর মৃত্যুর ঘটনায় বাংলাদেশ থেকে প্রতিবাদ জানানো হলেও গরু চোরাচালানকারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষরা বিএসএফ-কে সাধুবাদ জানিয়েছে।

রাজবাড়ীতে প্রতিমা ভাঙচুর করল মুসলিম দুষ্কৃতির দল

বাংলাদেশে হিন্দু প্রতিমা বা মন্দির প্রাঙ্গন অপবিত্র করা মুসলিম দুষ্কৃতিদের কাছে একটি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইরকম একটি ঘটনায় বুধবার (২৯/৪) রাতে রাজবাড়ী সদর উপজেলার আজুগারা গ্রামে একটি সার্বজনীন কালীমন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর করলো দুর্বৃত্তরা। রাতের অন্ধকারে এসে তারা শুধু কালীপ্রতিমা ভাঙচুরই করেনি, মন্দির প্রাঙ্গণও অপবিত্র করে দেয়। আজুগারা সার্ব্বজনীন কালীমন্দিরের সাধারণ সম্পাদক অরবিন্দ দাস জানায়, রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ তার ছোটভাই বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় মন্দিরের শীতলা প্রতিমা ভাঙা দেখতে পেয়ে বিষয়টি জানায়। তিনি তৎক্ষণাৎ মন্দিরে এসে দেখেন কে বা কারা মন্দিরের কালী প্রতিমাসহ অন্যান্য প্রতিমা ভেঙে দিয়ে গেছে।

এদিকে প্রতিমা ভাঙচুরের খবর পেয়ে রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার জিহাদুন কবীর, সহকারী পুলিশ সুপার রবিউল ইসলাম এবং সদর থানার ওসি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ওসি শহীদুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের দুটি পক্ষের বিরোধের জেরে অথবা কোন জীবজন্তু মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভেঙেছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ওসি-র এই হাস্যকর যুক্তি গ্রামবাসীরা মানতে নারাজ। দুষ্কৃতিরা আসলে সংখ্যাগুরু ইসলাম সম্প্রদায়ের। তাদের আড়াল করতেই ওসি ওরকম এক মনগড়া যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছেন বলে জনৈক গ্রামবাসী মন্তব্য করেন। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোন গ্রেপ্তার বা পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়নি। এই অঞ্চলের হিন্দুরা মুসলিম দুষ্কৃতিদের অত্যাচারে সদাই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

সন্ত্রাস ও পদচারণা

পবিত্র রায়

দুনিয়া জোড়া ইসলামি সন্ত্রাস, মানব সভ্যতার ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে। সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কগণ দেখছেন, সদর্থকভাবে তেমন কোন ভূমিকায় কোন রাষ্ট্রনায়ককেই দেখা যাচ্ছে না। শার্লি এবদোর উপর সন্ত্রাসী হানার পর সারা পৃথিবী জুড়ে ধিক্কার জানানো হল। সারা পৃথিবীর শান্তিকামী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান-রাষ্ট্রদূত-আধিকারিক প্রভৃতিগণ সন্ত্রাসের প্রতিবাদে প্যারিসের রাস্তায় পদচারণা করেছেন। তাঁরা সবাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যমত্য প্রকাশও করেছেন। সবই শুভলক্ষণ, তবে প্রশ্নাতীত নয়। প্রশ্ন ওঠে কেউ কেউ ভাবের ঘরে চুরি করছেন না তো? সৌদি আরব-প্যালস্টাইন এর প্রতিনিধিদের উক্ত মিছিলে পদচারণায় তেমনটাই মনে হয়।

সৌদি আরব ও পাকিস্তান, এই দুটি দেশের মূল নীতিই হল উপরে শান্তির বাণী শোনানো, আর গোপনে সন্ত্রাসবাদীদের পূর্ণাঙ্গ মদতদান। আমেরিকাও কম যায় না। নিজের স্বার্থের জন্য সন্ত্রাসবাদীকে সংগ্রামী বলতে এদের জুড়ি মেলা ভার। তালিবান সৃষ্টি আমেরিকার। ৩০-০১-২০১৫ তারিখে দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় ৪-এর পাতায় একটা ছোট্ট খবর ছিল, আমেরিকায় হোয়াইট হাউসে প্রেস সেক্রেটারী এরিক স্কাল্টজ বলেচেন, 'আই এস' জঙ্গি সংগঠন, আর তালিবানরা জঙ্গি সংগঠন নয়, সশস্ত্র বিদ্রোহী। আলকায়েদা সম্পর্কে নতুন করে আমেরিকা কিছু বলেন। নাইজিরিয়ায় 'বোকো হারাম' জঙ্গিগোষ্ঠী ইতিমধ্যে ধর্ম পরিচয় দেখে ২০০০ জন মানুষকে হত্যা করেছে। 'শার্লি এবদো'র ঘটনা দুঃখজনক, তারজন্য রাস্তায় নামা হয়, আর নাইজিরিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের একটা দেশ বলে কি সহানুভতিটাও পেতে পারে না। তাইতো ভাবের ঘরে চুরি করার সন্দেহের অবকাশ পাওয়া যায়।

শার্লির ঘটনার পর প্রতিবাদের জ্বালাময়ী ভাষণ ও দৃপ্ত পদচারণার স্মৃতি টাটকা থাকা অবস্থায়ই আর একটি খবর পাওয়া গেল। খবরটি হল জার্মান দৈনিকের দপ্তরে সন্ত্রাসবাদীরা আগুন লাগিয়েছে। ২৪-০১-২০১৫ তারিখে দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় আরও একটি খবর ছিল, ''ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের শাহী ইমামের ফতোয়া''। ফতোয়াটিতে সারা পৃথিবীর মুসলমানগণকে ফরাসী দেশ ও বাণিজ্যকে সর্বতোভাবে বয়কট করতে বলা হয়েছে। ৩০-০১-২০১৫ তারিখে 'এই সময়' কাগজে এবার একটি বিস্ফোরক খবর বেরলো। খবরটির শিরোনাম ছিল, ''এবার ওবামারও মাথা কাটার হুমকি দিল আই এস।''

১১-০১-২০১৫ তারিখে শার্লি এবদোর ঘটনায় পা মেলানোর প্রাপ্তি কি পাঞ্জাবী শাহী ইমামের ফতোয়া ও বারাক ওবামার মুণ্ডচ্ছেদের হুমকি? প্যারিস এর রাস্তায় পদচারণার সার্থকতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি? ২৮-০২-২০১৫তে ঢাকার খবর অভিজিত রায় নামে মুক্তিচিন্তার এক ব্লগার জামাত জঙ্গিদের হাতে খুন। ০৭-০৩-২০১৫ তারিখের খবর, ''অভিজিদের পর এবার খুন ওয়াশিকুর রহমান।'' প্রসঙ্গতও ওয়াকিশকুরও একজন মুক্তমনা ব্লগার। তেজদীপ্ত প্যারিস-পদচারণার পুরস্কার হিসাবে এইসব সভ্যতা ও মানবতা বিরোধী সংবাদ ও ঘটনা প্রাপ্তিই কি আমাদের নিয়তি? শুধুমাত্র সুন্দর মিঠে মিঠে কথা বললেই কি আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? আর ঐরূপ করলেই কি সন্ত্রাস থেকে আমাদের মুক্তি মিলবে? না, কখনোই এই ধর্মীয় উন্মাদদের নিকট থেকে সহজে পরিত্রাণ মিলবে না। এই সভ্যতা বিরোধীদের সন্ত্রাস-এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথমেই সন্ত্রাসের উৎস ও ক্ষমতা নির্ণয় করে এর মূলে সঠিক প্রতিষেধক প্রয়োগ করতে হবে। এরা আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করছে। এদের উদ্দেশ্যই হলো ওরা যেটা বলবে সেটাই শেষ কথা এবং সেটাই মানতে বাধ্য থাকবে মানব সমাজ।

সন্ত্রাসের উৎস সন্ধানের প্রেক্ষিতে একটু বিগত ইতিহাসের পর্যবেক্ষণ করাটা জরুরী। ১৭৮৪ সালে মরক্কো ও আলজিরিয়ার মুসলিম জলদস্যুরা তিনটি মার্কিন বাণিজ্য জাহাজ আটক করে ঐ জাহাজের কর্মচারীদিগকে ক্রীতদাস বানায়। দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার পর ৬০,০০০ ডলার মুক্তিপণ দিয়ে বন্দিদেরকে মুক্ত করার কথা বলা হয়, কিন্তু জলদস্যুরা যাদের আটক করেছিল তাদের ফেরতে পাওয়া যায়নি। কারণ তাদের বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। এইরপ বেআইনি কাজে বিরক্ত হয়ে ১৭৮৫ সালে লন্ডনস্থ ত্রিপোলির রাষ্ট্রদত আবদ-আল রহমানের সাথে দেখা করেন জেফারসন ও জন অ্যাডামস এবং তারা এমন সব কাজ কেন করছে জানতে চান আবদ-আল রহমানের নিকটে। আবদ আল রহমান তাঁদের জানান, মুসলিম কর্তৃত্ব অস্বীকারকারী সকল জাতিই পাপী, এরকম লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও যুদ্ধে বন্দিদেরকে ক্রীতদাস বানানো মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার ও দায়িত্ব। এবং এরূপ যুদ্ধে নিহত প্রত্যেক মুসলমানই নিশ্চিত বেহস্তে প্রবেশ করবে। আক্রমণ এড়াতে আবদ আল রহমান বশ্যতা কর দাবী করেন এবং নিজের কমিশন বা ঘুষ চান। এরপর স্বাভাবিকভাবেই জেফারসন আর কথা বলতে রাজি হন নি।

মরক্কোর সুলতান মৌলে ইসমাইল-এর চাহিদানুযায়ী বশ্যতা কর প্রদান করতে করতে রাষ্ট্রপতি জন অ্যাডামসের সময় (১৭৯৭-১৮০১) আমেরিকার জাতীয় বাজেটের দশ শতাংশে পৌঁছে যায়। মৌলে ইসমাইলের চাহিদাও দিনে দিনে বাড়তে থাকে। ১৮০১ সালে জেফারসন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। শুধু মরক্কোর নয়, ত্রিপোলিও একইভাবে আমেরিকাকে শোষণ করছিল। বার্বারি রাষ্ট্রগুলোকে শাসন করার জন্য ১৮১৫ সালে যখন আমেরিকা স্টিফেন ডেকাতুরের নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করছিলেন, তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসন একটি কালজয়ী উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''আমেরিকা নীতি হলো, যুদ্ধের চেয়ে শান্তি শ্রেয়, বশ্যতা করার চেয়ে যুদ্ধ শ্রেয় ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন কারো সাথে যুদ্ধ চায় না, তেমনি কারও নিকট থেকে শান্তিও কিনবে না।'' হ্যাঁ, মার্কিনীরা বার্বারি রাষ্ট্রগুলোকে বশ্যতা কর প্রদানের পরিবর্তে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। আর আজও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সেই নীতিকথাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে।

ইউরোপের দেশগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যার হার অত্যন্তই কম। ফ্রান্সে মাত্রই সাড়ে সাত শতাংশ। জার্মানিতে প্রায় প্রান্তিক জনজাতি। তা সত্ত্বেও সংখ্যাগুরু জনগণের উপর আক্রমণ করার সাহস পায় কোথা থেকে? সাহস লুকিয়ে আছে আবদ-আল-রহমানের জবানীতে। হ্যাঁ, পরধর্ম অসহিষ্ণুতার জন্য সৌদি আরব বা সন্নিহিত এলাকায় অন্য ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্বই বিলীন করা হয়েছে। বারে বারে, যুগে যুগে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি, মণিবাদী, হিন্দু প্রভৃতিগণ মুসলিম আক্রমণে সর্বহারা হয়ে শরণার্থী হয়েছে, দেশত্যাগ করেছে। ইহুদিদিগকে তো ছন্নছাড়া জাতিতে পরিচিত করেছিল ইসলামী আগ্রাসন। ধর্মান্ধ উন্মাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে সভ্য মানসিকতাকে কিছুদিনের জন্য শিকেয় তুলে রাখতে হবে। জানি একদল চিৎকার জুড়বে সন্ত্রাসীদের অধিকার নিয়ে। সন্ত্রাসীদের অধিকার থাকলে আমাদের অধিকার অস্বীকার করা হয়। সন্ত্রাসীদের দর্শনেই লুকিয়ে আছে ওদের থেকে নিস্তার-এর মন্ত্র। অভিজিত-ওয়াশিকুরকে যারা খুন করেছে, খুনীদের যারা

শেষাংশ ৭ পাতায়

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় হিন্দুদের উপর সহস্রাধিক মুসলিমদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ফলতা থানার মল্লিকপুর গ্রামে হিন্দুদের উপর ব্যাপক হামলা চালালো মুসলমানরা। মল্লিকপুর বাজারে ভাঙচুর ও লুঠপাট করা হল হিন্দুদের দোকানপাট। ভাঙা হল সরস্বতী স্পোর্টিং ক্লাব। গ্রামের ৫০টির বেশি বাড়ি ভাঙার সাথে সাথে গরু, ছাগলও লুঠপাট করা হল। প্রায় ২০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হল। মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হল। আতঙ্কে শতাধিক হিন্দু গ্রামছাড়া। সবই হল পুলিশের উপস্থিতিতে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ১৯ এপ্রিল রাতে। স্থানীয় সূত্রের খবর ওই রাতে জনৈক মৌলভী সাহেব গোপালপুরের একটি ইসলামিক জলসায় যোগদান

করার জন্য গাড়ি করে মল্লিকপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় একজন গ্রামবাসীকে ধাক্কা মারে। স্থানীয় লোকেরা গাড়িটিকে আটকে চালককে সামান্য মারধোর করে ছেড়ে দেয়। তখনকার মতন মৌলভী সাহেব গাড়ি নিয়ে চলে যান। কিন্তু রাত্রিবেলায় শ'দুয়েক মুসলমান মল্লিকপুর গ্রামে চড়াও হয়ে তিনটি হিন্দু বাড়ি সহ সরস্বতী স্পোর্টিং ক্লাব ভাঙচুর করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আবার পরেরদিন প্রায় চারশ মুসলমান মল্লিকপুর-গোপালপুর রাস্তার উপর জমায়েত হয়ে পথচারী হিন্দুদের মরোধার করা শুরু করে। স্থানীয় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হলে ডিএসপি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে সেই সময় পরিস্থিতি আয়ত্বে আনে। গতকাল ফলতা থানার আইসি প্রসেনজিত দাসের নেতৃত্বে শান্তি মিটিং হয় এবং সেখানে উপস্থিত উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার অঙ্গীকার করে। কিন্তু আজ দুপুর ২টা নাগাদ তৃণমূলের ফলতা ব্লক সভাপতি লতাউল হোসেন মোল্লার নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সহস্রাধিক মুসলমান মল্লিকপুর গ্রামের হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিবেক কোলের ওষুধের দোকান, মৃত্যুঞ্জয় মন্ডলের রেশন দোকান, দীপক পুরকাইতের মুদিখানার দোকান, অজিত দের হার্ডওয়্যারের দোকান ভাঙচুর ও লুঠপাট করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। নবীন মন্ডল, কিশোরী ভক্ত, কানাই সরদার, তপন সরকার, মদন সরকার, অষ্ট সরদার ও নিতাই সরদারের বাড়িসহ প্রায় ৫০টি বাড়িতে ভাঙচুর, লুঠপাট করা হয় ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। হিন্দুদের বাড়ি থেকে জিনিসপত্রের সাথে গরু, ছাগলও লুঠ করা হয়েছে। হিন্দু মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। শতাধিক হিন্দু গ্রামছাড়া।

নেপালে বিধ্বংসী ভূমিকম্প

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি ভারতের সহানুভূতি প্রশংসনীয়

গত ২৫শে এপ্রিল এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে নেপালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পোখরা, কাঠমান্ডু সহ আশেপাশে এলাকার দেড় লক্ষেরও বেশি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। হতাহতের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি।

ভূমিকম্প হওয়ার পর দ্রুত ভারত সরকার নেপালের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সাতটি হেলিকপ্টার সহ উদ্ধারকারী দল নেপালে এখন কাজ করে চলেছে। নিজেদের প্রাণ সংশয় করেও ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে জীবন্ত প্রাণগুলোকে উদ্ধারের কাজে যারা সদা ব্যস্ত। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য উদ্ধার কাজ বেশ ব্যাহত হচ্ছে। ভারত সরকার অসহায় নেপালবাসীর জন্য টেন্ট, খাবার, জল, ঔষধ পাঠিয়েছে। প্রয়োজনে আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখেন। ভূমিকম্প কবলিত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল তিনি শুধু পরিদর্শনই করেন নি, সীমিত সাধ্যের মধ্যেও তিনি নেপালের মানুষগুলোর জন্য যত দ্রুত সম্ভব ত্রাণ পাঠিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই সাধু প্রচেষ্টাকে আপামর জনসাধারণ যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

বাইনানে মুসলমানদের তাণ্ডব অব্যাহত

হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত বাইনান গ্রামে গত কয়েকমাস ধরে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে মুসলিম দুষ্কৃতিরা। গতমাসে স্বদেশ সংহতি সংবাদে বাইনানের ঘটনা বেরিয়েছিল। গত ২৩শে এপ্রিল তারক দাস নামে এক ব্যক্তিকে বিনা কারণে প্রচণ্ড মারধোর করে দুইজন মুসলমান যুবক। এদের একজন সেখ কমল (পিতা সেখ লাল), অপরজন সেখ নবাব (পিতা সেখ সামসের)।

তারক দাসের একটি বাগান আছে। বাগানে অনেকগুলো কলা গাছ সহ অন্যান্য গাছ ছিল। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা সেই গাছগুলো কেটে দেয়। পরেরদিন তারকবাবু জানতে পেরে বাগানে গিয়ে ঐ গাছগুলো পরিষ্কার করছিল তখন ঐ দুইজন যুবক তারকবাবুকে বলে তাদের দিয়ে কাজ করাতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত তারকবাবু একটু রুক্ষস্বরেই বলেন যে কাকে দিয়ে কাজ করাব সেটা আমার ব্যাপার। তখন সেখ কমল ও সেখ নবাব তারকবাবুর কাছে দশ হাজার টাকা দাবি করে বসে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে তারা তারকবাবুর উপর চড়াও হয়। তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে। এই অবস্থায় তারকবাবু হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে বাগনান থানায় উক্ত যুবকদের নামে লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত থানা থেকে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এইরকম অবস্থায় বাইনানের মানুষ যদি নিজে থেকে প্রতিবাদের পথে না যায় তাহলে আগামীদিনে অবস্থা আরও খারাপ হবে।

আল জাজিরা টিভি-তে ভারতের বিকৃত মানচিত্র ঃ প্রতিবাদে সম্প্রচার বন্ধ

সচেতনভাবে আলজাজিরা টিভি ভারতের বিকৃত মানচিত্র সম্প্রচার করেছে, এই অভিযোগ উঠছিল অনেকদিন ধরেই। সম্প্রতি বারবার ভুল মানচিত্র দেখানোর অভিযোগে ভারতে আন্তর্জাতিক খবরে চ্যানেল আল জাজিয়ার সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রদাচর মন্ত্রক। তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচদিন (২১শে এপ্রিল থেকে ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত) ভারতে আল জাজিরার সম্প্রচার বন্ধ থাকবে। ২০১৩-১৪ সালে জম্মু-কাশ্মীরের কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে ভারতের মানচিত্রে দেখানোর অভিযোগ ওঠে চ্যানেলটির বিরুদ্ধে। মানচিত্রে লাক্ষাদ্বীপ ও আন্দামানের অস্তিত্বও ছিল না বলে অভিযোগ। বিষয়টি ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল (এসজিআই)-র তত্ত্বাবধানে আসে। এসজিআই জানায়, ওই মানচিত্রের সঙ্গে 'সার্ভে অব ইন্ডিয়া'-র মানচিত্রের কোন মিল নেই। আলজাজিরা চ্যানেলে প্রদর্শিত মানচিত্রটি ভারতের জাতীয় মানচিত্র নীতির পরিপন্থী। এইট চ্যানেলটির কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল না এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৬ পাতার শেষাংশ

সন্ত্রাস ও পদচারণা

পরিচালনা করেছে, তাদের পরিণতি যদি অভিজিতদের মত করা হয়, সন্ত্রাসীও চমকে উঠবে। সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসের শিকার হয়ে পালাতে থাকবে। সৌদি আরব সম্পর্কে তার চাইতে বেশি অসহনশীল হতে হবে। বর্তমানে সৌদি আরব শিয়াদেরকেও সহ্য করতে পারছে না।

পরিশেষে জানাতে চাই শতবার পদচারণা করেও সন্ত্রাসের শেষ হবে না। যে আমেরিকা গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছে, সেই আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মাথা উঁচু করে বাঁচার মন্ত্রও বলে দিয়েছেন। প্রতিজ্ঞা করতে হবে শান্তি আমরা ক্রয় করব না, ভিক্ষা করব না, বিতরণ করব। সারা পৃথিবীকে একদিন ম্যাডিসন সাহেবের মন্তব্যের নিরিখেই শান্তি খুঁজতে হবে। হ্যাঁ, সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে হবে, গোড়ায় আঘাত করতে হবে, ম্যাডিসন সূত্রই মানতে হবে।

চলতি বছরে ১৬৪ বার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান

চলতি বছরে জম্মু-কাশ্মীরে আন্তর্জাতিক ভারত-পাক সীমান্তে ১৬৪টি সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। বলাবাহুল্য, প্রতিবারই পাকিস্তানের দিক দিয়েই এই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তানের তরফে এই হামলায় দুইজন সাধারণ ভারতীয় সহ একজন নিরাপত্তারক্ষী মারা গিয়েছেন। লোকসভার এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এই কথা জানান। সঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং গুজরাট সংলগ্ন পাক সীমান্তে ১৬ বার অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিয়েছে বি.এস.এফ।

৬০০ কোটির মাদকসহ গ্রেপ্তার ৮ পাক নাগরিক

গত ২০ এপ্রিল গুজরাটের পোরবন্দর থেকে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার মাদকসহ আট পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল উপকূলরক্ষী বাহিনীর জওয়ানেরা। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গুজরাট উপকূলের কাছে ভারতীয় নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা যৌথ অভিযান চালিয়ে ওই পাক নাগরিকদের গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাদের নৌকাটিও। ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৩২ কেজি মাদক। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। এই বিষয়ে উপকূলরক্ষী বাহিনীর প্রধান এস ই গুপ্তা জানান, আরব সাগরে আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে ৮ জন পাক নাগরিকসহ মাদকভর্তি নৌকাটিকে আটক করা হয়। ধৃত ওই মাদক চোরাচালানকারীকে নৌবাহিনী, উপকূলরক্ষী বাহিনী ও মাদক নিয়ন্ত্রক সংস্থা জেরা করবে। এই ঘটনার পিছনে পাক নৌবাহিনীর কোন মদত আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে এস ই গুপ্তা বলেন, ঐ চোরাচালানকারীদের জিজ্ঞাসা করে যে তথ্য পাওয়া যাবে, তাতেই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে।

গণধর্ষণ ও বিক্রি

কুড়ি বছরের কারাদণ্ডের সাজা দিল আদালত

প্রেমের ফাঁদে ফেলে এক মাধ্যমিক ছাত্রীকে অপহরণ করে গণধর্ষণ ও পরে বিক্রির অভিযোগে এক যুবকের কুড়ি বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। এমনই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবারে।

ডায়মণ্ডহারবারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক অঞ্জলি সিন্‌হা অপরাধীর এই সাজা ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্ত রমজান সেখ ওরফে রূপচাঁদ রায়দিঘির কৌতলার বাসিন্দা। এই অপরাধে যুক্ত রমজানের তিনসঙ্গী নজির মোল্লা, নিজাম মোল্লা ও সিরাজ মোল্লার আগেই সাজা ঘোষণা করেছিল আদালত। ১৯শে এপ্রিল বুধবার আদালত রমজানকে কুড়ি বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি চার হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

২০১৩-র মার্চের ২৬ তারিখ ওড়না কেনার নাম করে ডায়মণ্ডহারবারের আসে ছাত্রীটি। মোটা টাকায় বিক্রি লোভে রমজান মেয়েটিকে নিয়ে যায় দিল্লিতে। সেখানে আটকে চারজন গণধর্ষণ করে। তারপর রাজস্থান ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয় গুজরাটে। মোটা টাকার বিনিময়ে গান্ধীনগরের এক পতিতাপল্লীতে বিক্রি করে দেওয়া হয় তাকে।

কঙ্গোয় নিকাবের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো

কঙ্গো হলো আফ্রিকার একটি মুসলিম দেশ যেখানে নিকাব তথা মুখ ঢাকা বোরখার উপর নিষেধাজ্ঞা আরো করা হলো। কঙ্গোর ইসলামিক সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান আলহাজ অঅবদুলাই জিবরিল জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে দেশে সন্ত্রাসবাদ ও নিরাপত্তাহীনতা রুখতেই নিকাবের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে বাড়িতে কিংবা ধর্মীয় স্থানে মহিলারা মুখ ঢাকা নিকাব ব্যবহার করতে পারেন, তবে প্রকাশ্য স্থানে তা করা যাবে না। তবে চাদর, খিমার (মুখমণ্ডল ছাড়া আপাদমস্তক ঢাকা বোরখা), শায়লা, আল আমাইরা (স্কার্ফ বা গলা ও মাথাঢাকা পোশাক বিশেষ) প্রভৃতি পোশাকের উল্লেখ করা হয়নি ঐ বিবৃতিতে। ইসলামি সংগঠনগুলি সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তাঁরা বলেছেন যে নিকাব বা মুখ ঢাকা পোশাকের আড়াল ব্যবহার করে অনেকে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে কঙ্গোর খুব কম মহিলাই নিকাব বা বোরখা পরে।

এর পূর্বে পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে একই কারণে নিকাবের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে বিশ্বজুড়ে মুসলিম মৌলবাদীরা তীব্র হৈ চৈ করেছিল। তারা বলেছিল যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মুসলিমদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করার জন্যে এই সরকার এমন পদক্ষেপ করেছে। এমনকি তারা ইসলাম-বিদ্বেষের অভিযোগ তুলেছিল সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বিরুদ্ধে। কিন্তু কঙ্গো তো মুসলিম দেশ, সুতরাং এ সব অভিযোগ তোলার সুযোগ তাদের নেই। তাই কোনো হৈচৈও এখনও পর্যন্ত শোনা যায়নি। তবে নিকাবের আড়ালে অপরাধমূলক কাজ করার দায় চাপিয়েছে অমুসলিমদের উপরে। কঙ্গোর ইসলামি সংগঠনগুলো বলেছে যে, নিকাবের আড়ালে অমুসলিমরা যে অপরাধমূলক কাজ করছে তা প্রতিহত করতে সরকার এরকম পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে।

কঙ্গোর ইসলামি সংগঠনগুলোর কৈফিয়ত যে একটা মিথ্যা অজুহাত তা বলাবাহুল্য। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে আল্লাহর নামে মুহম্মদের তৈরি করা আইনটি জনবিরোধী এবং মুসলমানরা সেই আইনটি বর্জন করতেই চায়।

তারাপীঠে মধুচক্র ঃ গ্রেফতার হোটেল মালিক

বিশেষ সূত্রে খবর পাওয়া গেল তারাপীঠের চাঁদনী হোটেল থেকে ১৮ এইপ্রল রাত প্রায় ১২টা নাগাদ ১৮ জোড়া যুবক যুবতীকে আটক করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে প্রায় ৮৫টা তাজা বোমাও উদ্ধার হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই চাঁদনী হোটেলে এই মধুচক্র নতুন নয়। হোটেলের মালিক জিন্নার আলির বিরুদ্ধে আগেও একাধিকবার হোটেলের মধ্যে এই ধরণের অবৈধ ব্যবসা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় লোকেদের কথায় পুলিশের সাথে যোগসাজসে জিন্নার আলি অবাধে তার এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। 'ডীল' ভেঙে যাওয়ায় পুলিশের এই সক্রিয়তার কারণ বলে মনে করছে এলাকার মানুষ। শোনা যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধৃতদের পি.আর. বন্ড-এ ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু হোটেল মালিক জিন্নার আলির বিরুদ্ধে পুলিশ কি ব্যবস্থা নেয় সেটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন।

প্রশাসন নির্বিকার, সংবাদমাধ্যম যথারীতি নীরব

আবারও হিন্দুর উপর নেমে এলো জেহাদের থাবা

গত ৮ই মে নদীয়া জেলার হাঁসখালী থানার উলাসী পাড়ার হিন্দুরা অনুভব করলেন ইসলামিক জেহাদের উত্তাপ। এই গ্রামটিতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। মাত্র ৫০-৬০ ঘর হিন্দুর বাস যাদের অধিকাংশই আবার তফশিলি গোষ্ঠীভুক্ত। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে মাসখানেক আগেই। স্থানীয় উলাসী পাড়া বাজারে একটি ছোট জামাকাপড়ের দোকান চালান শ্রী বিমল ঘোষের বড় ছেলে শ্রী বিমান ঘোষ। মাসখানেক আগে একটি বালির ট্রাক তার দোকান ধাক্কা মারে। এরফলে দোকান ঘরের শার্টার ভেঙে যায়। খোঁজ নিয়ে জানা যায় সেটি স্থানীয় (মুসলিম) মহিলা ডন পাপিয়া মণ্ডলের।

কে এই পাপিয়া? তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল, সে একটি দুষ্কৃতি গ্যাঙের সর্দারণী। এলাকায় তারা মূলতঃ শিশু ও নারী পাচার থেকে শুরু করে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। হাঁসখালী থানায় বিভিন্ন সময়ে তার নামে বিভিন্ন অভিযোগ হয়েছে। বার কয়েক সাজা পেলেও পুলিশি সহায়তার তার এখন পোয়াবারো। ভুলেও এখন তার দিকে আঙুল তোলার ক্ষমতা কারও নেই। এ হেন পাপিয়ার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে বিমান তার চক্ষুশূল হয়।

এই নিয়ে বেশ কিছুদিন বিবাদ চলরা মধ্যেই গত ৮মে রাতে বাজারের মধ্যেই প্রকাশ্যে রাস্তায় পাপিয়ার এক ছেলে বিমানের মাথায় রড দিয়ে আঘাত করে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। এরপর বিমান এবং তার ভাই সৌমেনের সঙ্গে উক্ত দুষ্কৃতির কথা কাটাকাটি হয়। এরপর সেই রাতেই ছেলের নিরুদ্দেশ হওয়া এবং এই সংক্রান্ত অভিযোগে বিমানদের অভিযুক্ত করে পাপিয়া হাঁসখালী থানাতে একটি অভিযোগ দায়ের করে। পরদিনই পুলিশ অতি সক্রিয় হয়ে বিমানদের বাড়ি চড়াও হয় এবং তাদের পাপিয়ার ছেলেকে খুঁজে বের করবার জন্য মারাত্মক চাপ দিতে থাকে। এই ঘটনার কিছু সময় পরেই স্থানীয় মুসলমানেদের জমিতে একটি ঘড়ের গাদায় কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় (স্থানীয়দের মতে কিছু মুসলমান ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই দুষ্কর্ম করে) এলাকায় রটে যায় যে, হিন্দুরা মুসলমানের জমির ফলল দখল করে জমিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। মুহূর্তে স্থানীয় মসজিদের মাইকের উত্তেজক ঘোষণায় প্রভাবিত হয়ে কয়েকশো মুসলমান একজোট হয়ে রাত ৮টার দিকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহকারে এবং মুখে আল্লাহ আকবর ও নারায়ে তকবির ধ্বনি দিতে দিতে যথাক্রমে বিমল ঘোষ, নিবারণ ঘোষ এবং ভোলা ঘোষের বাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মুহূর্তের মধ্যে বিমল ঘোষের বাড়ি আক্রমণকারীরা তছনছ করে। বাড়ির আলমারি ভেঙে টাকাপয়সা, গয়নাগাটি সহ দামী জামাকাপড় লুঠ করা হয়। ঠাকুরের আসন লণ্ডভণ্ড করে তাদের টাটা সুমোটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বিমানকে তার মোটরসাইকেলের উপর ফেলে দুষ্কৃতিরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। বিমান রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাদের বাড়ির নিরীহ গবাদি পশুগুলিও এই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। খবরে প্রকাশ মুসলমান দুষ্কৃতিরা প্রথমে এই অবলা পশুগুলিকে খুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু অসফল হয়ে সেগুলিকে নির্মম প্রহার করতে থাকে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বিমানের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী বার বার শিউরে উঠছিলেন। তিনি বলেন, তাকে দুষ্কৃতির দল চুলের মুঠি ধরে উঠানে এনে ফেলে এবং অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে থাকে। এরপর তার শ্লীলতাহানীর অভিঘাতে ভদ্রঘরের নববধূটি একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

এরপর নিবারণ ঘোষের বাড়িতে আক্রমণ করে তাদের বাড়ির জলের পাম্পটি উপড়ে ভেঙে ফেলা হয়। বাড়ির একপাশে রাখা নতুন ট্রাক্টরটিতে ভাঙচুর করে। বাড়ির গ্রিল, দরজা, জানালা সব ভাঙার পর একই কায়দায় আলমারিতে রাখা সোনার গয়না ও অর্থসহ সর্বস্ব লুটপাটের পর অবশিষ্টাংশে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগানোর তোড়জোড় শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই সময় পুলিশ দুষ্কৃতিদের এই কাজ করতে বারণ করে এবং তাদের বলে যে আগুন লাগালে ঘটনার ভয়াবহতা অন্যদিকে মোড় নিতে পারে এবং সেই পরামর্শমাফিক তারা তাদের পরিকল্পনা বাতিল করে। নিবারণ ঘোষের স্ত্রী জ্যোৎস্নাদেবীর গায়েও হাত দিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয়।

পাশে ভোলা ঘোষের বাড়িটিও একইভাবে জেহাদি আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু এই প্রতিবেদক পুলিশের প্রবল বাড়াবাড়িতে (ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার প্রকাশ্য হুমকিতে) আর তার বাড়ি পৌঁছাতে ব্যর্থ হন।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই সম্পূর্ণ ঘটনা স্থানীয় ওসি সহ পুলিশ বাহিনীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে সংগঠিত হয়। তাদের মতে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আলম মণ্ডল, জালাল শেখ, জুলফিকার মণ্ডল এবং মিঁয়া সহ শতাধিক দুষ্কৃতিরা সকলেই টিএমসি-র আশ্রিত। তারা আরও জানিয়েছেন যে ঘটনার সময় পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় টিএমসি-র কয়েকজন হিন্দু নেতাও উপস্থিত নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন। যা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় টিএমসি হিন্দু নেতাদের এহেন আচরণে হিন্দুরা এই প্রতিবেদকের কাছে উষ্মা প্রকাশ করেন। অথচ হিন্দুদের উপর এই ভয়ঙ্কর অত্যাচার ঘটে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই শান্তিপুর থানার পুলিশ পাপিয়া মণ্ডলের ছেলেকে খুঁজে বের করে হাঁসখালী থানার হাতে তুলে দেয়। ততক্ষণে হিন্দুদের যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, পুরো ব্যাপারটাই পাপিয়া এবং পুলিশের যোগসাজশে সংগঠিত। সব থেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, এতকিছুর পরেও পুলিশ এই ঘটনায় এখনো কোন এফ আই আর গ্রহণ করেনি। এই বিষয়ে জানার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ওসি-র (বড়বাবু) সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই প্রতিবেদককে গ্রেফতার করার হুমকি পর্যন্ত দেন। স্থানীয় হিন্দুরা এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

হিন্দু মহাসভার মামলা

কোর্ট চত্বরের মসজিদের বৈধ কাগজ চাইল আদালত

দিল্লি হাইকোর্ট চত্বরে ৫ নং গেটের কাছে একটি মসজিদ আছে। মসজিদটি তেমন প্রাচীন নয়। হিন্দু মহাসভা এই মসজিদটির বৈধতা নিয়ে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে। হিন্দু মহাসভার সদস্য অজয় গৌতমের অভিযোগ, কোর্ট চত্বরের গেটের প্রবেশ পথে থাকা মসজিদটি প্রাচীন নয়, তাই এটি সংরক্ষণ করার কোন প্রশ্ন নেই। অবিলম্বে এই মসজিদ ভেঙে ফেলা উচিত বলে তিনি দাবি করেছেন। হিন্দু মহাসভার এই অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লি হাইকোর্ট ওই মসজিদের কাগজপত্র চেয়ে পাঠিয়েছে।

কোর্টের ৫ নং গেটের কাছে ওই মসজিদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা নামাজ পড়ে। কিন্তু মসজিদটির প্রাচীনত্ব নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। হিন্দু মহসভার দাবি, মসজিদটি প্রাচীন তো নয়ই, তার উপর মুসলমানরা কোন অনুমতি না নিয়েই এই মসজিদটি কোর্ট চত্বরে তৈরি করেছে। এখন কোর্টের রায়ের উপর মসজিদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

“ক্ষাত্রশক্তি জাগরণ দিবস”

মহারাণা প্রতাপ সিংহের ৪৭৫ তম জন্মদিবস আগামী ২১শে মে। ওই দিন হিন্দু সংহতি ক্ষাত্রশক্তি জাগরণ দিবস রূপে উদ্‌যাপন করতে চলেছে। বাংলার মাটিতে যে ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা মুসলিম আক্রমণকারীদের সামনে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, সেই বর্গক্ষত্রিয়, পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়, কর্মক্ষত্রিয়রা আজকে আমাদের সমাজের চোখে বাউরী, পোদ, কাওড়া নামে পরিচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা আজ সমাজে তাঁদের যোগ্য মর্যাদাটুকুও পায়নি। মুসলিম আগ্রাসনের হাত থেকে বাংলার স্বাধীনতা তথা হিন্দুর নিরাপত্তার জন্য যারা নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু ঝরিয়ে বীর বিক্রমে লড়াই করেছিল, চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ তারাই স্বঘোষিত ‘হায়ার ক্লাস’ হিন্দুর চোখে ‘ছোট জাত’! তারাই আজকে উচ্চবর্ণের তৈরি সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে সবার পিছনে! এই কৃতঘ্ন মানসিকতার ফলশ্রুতি হল বাঙালি হিন্দু আজ একটি নির্বীর্য, কাপুরুষ জাতি। সে তার পায়ের তলার মাটি বাঁচাতে অসমর্থ। সে তার মা-বোনের সম্ভ্রম রক্ষা করতে অক্ষম। এমনকি আজ এই প্রবল সুনামীর সামনে ‘বুদ্ধি বোঝাই বাবু মশাই’-এর মত বাঙালি হিন্দুর জীবনটা ‘ষোল আনাই মিছে’ হয়ে যেতে চলেছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় কি আজও আসেনি? আজও কি বাঙালি হিন্দু ‘বীরপূজা’ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না? আজও কি আমরা ক্ষত্রিয় রক্তের যোগ্য মর্যাদা দিতে বিরত থাকবো? যদি তাই হয়, তাহলে বাঙালি হিন্দুর বিনাশ সুনিশ্চিত। কারণ বাঙালির সম্পদ ‘বুদ্ধি’ আর ‘কৌশল’ দিয়ে এই ভয়াবহ মুসলিম আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করা যাবে না। এর জন্য চাই ক্ষাত্রতেজ, অপরিসীম সাহস, আর ক্ষত্রিয় রক্তের বলিদানী মনোবৃত্তি। যাদের রক্তে এই অসাধারণ গুণাবলী বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত, সেই ঘুমন্ত সিংহদের আজ যোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে হবে। দীর্ঘকাল বাবদ অবহেলিত, পদদলিত বাঙালি ক্ষত্রিয় সমাজকে আজ ক্ষত্রিয়ের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। যুগ যুগ ধরে আমরা যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মহারাণা প্রতাপের জন্মদিবস ছাড়া এই কাজের যোগ্য উপলক্ষ আর কী হতে পারে! মেবারের স্বাধীনতা রক্ষায় ভীল সৈনিকদের নিয়ে যে প্রবল পরাক্রম তিনি সেদিন দেখিয়েছিলেন, তা আজও বাঙলার পরিস্থিতির সাপেক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আসুন এই ক্ষত্রিয় কুলতিলকের জন্মতিথিতে আমরা বাঙালি ক্ষত্রিয় সমাজকে ক্ষত্রিয়ের মর্যাদায় অভিষিক্ত করি।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686